প্রকাশক:

শ্রীবিজয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
বালিকা দেবীপুর, বর্ধন।

প্রকাশ—শ্রীবিজয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
মেট্টাকায় গেম,--
২৫৩২ কলকাতা। তুল্য শ্রীতি কলিক।
জীবনের দুর্গমপথে
যাহাকে সগীনী করিয়াছি
তাহাকেই
<table>
<thead>
<tr>
<th>উপন্যাস</th>
<th>নাটক</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>নবদ্বীপের বৈফারী</td>
<td>ভৌমিলিঙ্ক</td>
</tr>
<tr>
<td>বঙ্কীর গৃহীণী</td>
<td>রতনেন রতন</td>
</tr>
<tr>
<td>দেওয়ানা রাজ্জী</td>
<td>স্বরাজীরাজপুরি গান</td>
</tr>
<tr>
<td>মুলাফার প্রিয়া</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ভিন্দারাণী শৈল</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
উপহার

আমার

শ্রী

দুর্গনের সঙ্গী
উপহার দিলাম।

সাক্ষর

তাং
দুঃখমেষ্ট সঙ্গীনী

(১)

এ সংসারে নারীর সব চেয়ে বড় গর্ভ বোধ হয়—রূপের গর্ভ। শিক্ষাও সত্যতা তাহাকে যে পরিমাণে উত্তেজিত করে—রূপের গর্ভ বোধ করি—তার চেয়ে আরও বেশী করিয়া থাকে—কারণ এই জিনিষটাই তার একান্ত নিন্দ্য। রূপের অভাব এই জাতিকে যে পরিমাণে নষ্ট করিয়া দেয়—রূপ ঠিক সেই পরিমাণেই গর্ভিত করে—তাতে রূপের অধিকারিণী যতই মার্জিত-রূপ হউন—এসতাই বাধ হয় সংঘদূর্ঘণ রমণীই অনুভব করিতে পারেন। নহিলে স্ত্রীর প্রথম দিন হইতেই শক্তি সৌন্দর্যের পদানত রহিয়াছে কেন?

শক্তি অবশ পদানত থাকিয়াও তাহার অধীনতাকে সচেতনেই সহ করিতে পারে—কিন্তু প্রতিপক্ষের প্রভুত্বের তার বীর্য যুদ্ধ মাঝে আসিয়া তাহার এই সাধের দাসত্বকে একেবারে দৃঢ় করিয়া তোলে। নহিলে বীর্যের রায় বড় লোকের জামাতা হইয়াও পথাশ্রয় করিতে বাধ্য হইবে কেন?
হুর্গমের সঙ্গীনী

এই বীরেশ্বরের পিতামহেরা শেষবেলে তাহাকে তাগু করিয়া গিয়াছিলেন; আর সে পিতৃব্যের আশ্রয়ে থাকিয়া নিতান্তই পতিতের মত—উভয়ের মাঝে আগাছার মত আপনই বাড়িয়া। উঠিয়াছিল—তাহাকে সজ্জীবিত করিতেও কেহ চেষ্টা করে নাই; ভাঙ্গ করিতেও কেহ লালায়িত হয় নাই। কিন্তু অসংখ্য বোধ করি অর্থ দেখিয়াই গ্রস্ত হন না—তাই বীরেশ্বরের ভাগ্যেও একদিন অগ্নিগৌরবে সমৃদ্ধ হইয়াছিল।

সে একবারকার কাল-বৈশাখীর ঝড়ে বিশালকায়। শীতলাঙ্গী গর্জিয়া। গর্জিয়া পৃচ্ছে প্রায়নে বোধ করি তীরভূমিকেই গ্রাস করিতে উভয় হইয়াছিল। আর উভয়ের মহাত্মাবলের মত পশু-পক্ষী যাহাকেই সমুদ্রে পাইতেছিল—তাহাকেই নিজের বিরাট বিশাল উদরে টানিয়া আনিয়া। নিজের মহামার মৃত্তির করলাল করিয়া দিতেছিল। ঠিক এই সময়ই একখানি নৌকা। সেই আবার পড়িয়া। ঘুরিয়া বাণী রাখিয়া স্পোরের মুখে ছুটিয়াছিল। মারিতে তাহার আজ্ঞা সংক্রান্তির দোহাই দিয়া—সমস্ত শাক্তি দিয়া—দেবতার দল! ভিক্ষা করিয়া। কিছুই করিতে পারিতে ছিল না। কারণ দেবতা তখন করুণাতীত ধরিয়াছিলেন—তখন সংহার ভিল অন্য বাণী দেবতার মুখেই ছিল না। তখন মারুশের আর্শনাদ জলের আর্শনাদের সঙ্গে মিশিয়া। বোধ করি, কোনো অবধি অগাধ মৃত্তির মহাসমুদ্রের দিকে।
দুর্গমের সঙ্গীনী

ছুটিয়েছিল, প্রলয়ের চেতু চারিদিকে কি মহাপ্রলয়ের স্থষ্টি করিয়াছিল—তাহা চক্ষে না দেখিলে বুঝিবার সামর্থ্য কাহারও নাই—চারিদিকের ধূসিরাশি গগন-গহন-ব্যাপী মূর্তি ধরিয়া। বোধ করি স্থষ্টির মাঝেই অনান্ত কাঙ্গঘটাইবার উত্থাগ করিতেছিল। আর ভরঙের সেই তাগুর নর্তন ও বাহিরের ভীষণ দর্শন প্রকৃতি দেখিয়া বোঝার আরোহী বোধ হয় ইহুই মন্ত্র ভুলিয়া। গিয়াছিলেন—কারণ ঠিক সেই সময়ই একটা প্রাকৃত বাঙ্গা আসিয়া নৌকা-খানাকে একত্রে উষ্টাইয়া দিল—এই মাঝির আকৃতনাদ জলের আকৃতনাদে মিশিয়া গেল। কিন্তু সেই সফেন সিলিল রাশির মধ্যে হইতে, নিশ্চিত মৃত্যুর অন্ধকার গর্ভ হইতে সহসা যাহার সবল হস্ত রুদ্ধ আরোহী রমেশবাবুর হাতটা ভীম বলে চাপিয়া ধরিল—তাহাকে যমুদুত ভাবিয়াই রমেশ বাবুর লুপ্ত-প্রায় চেতনা একত্রে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

কিন্তু সেই বিলুপ্ত চেতনা যখন পুনরায় চৈতন্য লাভ করিল। আর দেখা গেল যে, যে লোকটা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া ছিল সে যমুদুত নহে, যমুদুত নহে—তাহারের চেয়েও শক্তিশালী। একটা মাহুষ মাত্র, কারণ সে তাহার বাহুয়ে বলে তাহাকে ফিরাইয়া না আনিয়ে যমুদুতের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার সত্তাবনা তাহার কিছু মাত্রই ধারিত না—তখন রমেশবাবু নির্বিশয় আনন্দে তাহাকে আলিঙ্গন ৩
ধূরিমের সঙ্গীনী

করিলেন। আর এই প্রিয়-দর্শন যুবক নিষ্ক্র ও নিসহায় জানি ৷ পরম সমাদরে তাহাকে নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। শুধু লইয়াই গেলেন না—বারেখরকে লইয়া জানি ৷ নিজের একাত্র কণ্ঠ। সুন্দরী সুন্দরী সুমার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। নিষ্ক্র৷ বারেখর অতুল ঐশ্বর্যের অধিক রী হইল।

(২)

সুমারা সুন্দরী ছিল উটি৷ এবং তাহার পিতার অতুল ঐশ্বর্য ছিল ইহাও সত্য, কিন্তু যে ঐশ্বর্য থাকিলে অতি কৃৎসন্ধ নরনারাণো সুন্দর নামে অভিহিত হয়, সুন্দরী সুমার সেইটাই ছিল না—তাহার সুদুর ছিল না—আর যাহ। ছিল তাহা রূপের গর্বে কি পিতার ঐশ্বর্যের গর্বে এতই গর্বিত যে তাহার সন্ত বারেখর নরনো—যে কোন পুরুষই বোধ হয় সহ করিতে পারিত না। পিতার জীবনদাতা বলিয়া। পিতা যে একটা পথের লোককে ধরিয়া। আরিনী তাহার সহিত বিবাহ দিলেন—ইহা সুমার। পিতার অতুল নিন্ধুরতার পরিচয় বলিয়া মনে করিল। আর স্বর্গভুক্ত জননীর উদ্দেশে হই একবিং অক্ষ্ম ফেলিতেও কটা করিল না।
ঘুর্ণমের সঙ্কিনী

কিন্তু স্বৰ্গমাতা বুঝিলনা—যে, পৌরুষের প্রথম সীমায় পদার্পণ করিয়াই যে দিন তাহার পিতা গৃহিণী স্বামীকে হারাইয়া সংসার অন্ধকারে দেখিতেছিলেন—সেদিন স্বৰ্গমাত্র বিন্ন তাহার সামৰ্থ্যার স্থল ছিল না—সেদিন তিনি এই একটি মাত্র কন্যাকে নিয়মায় শোক ও দুঃখকে সহিতে পারিয়াছিলেন। সেত’ বুঝিল না যে, আজ এক ধনীর সহিত তাহার বিবাহ দিলে রুদ্ধ পিতার একমাত্র অবলম্বনের সঙ্গে সম্ভব তাহার করিতে হইবে। আর তাহাতে তাহার যে দুঃখ হইবে—তাহা কন্যার সহিতেও পিতার সহ অত্যন্ত কঠিন হইবে। কিন্তু পিতা যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহা তিনি করিয়াছেন এবং কন্যা যাহা বুঝিয়াছিল—সে তাহাই করিতে। ছিল কিন্তু মাত্র হইতে বোঝার বীরেশ্বরের দুঃখ অশান্তির অত্যন্ত ছিল না। সে দুঃখের ছেলে—দুঃখ করিয়া এবং দুঃখের ভাত স্বাভাবিক তাহার দিনগুলো একেক শান্তিতেই কাটিতেছিল। বড় লোকের জামাতা হইয়া এবং প্রায় অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া এই যে বাইরের দুঃখের বিনিময়ে সে অল্পদের দুঃখ কিনিয়া। বিস্তর—ইহার প্রচণ্ড শাসনের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিবে কে? সে যে ইহার চায় নাই—চাহিয়া ছিল শুধু বিশেষের প্রাণ রক্ষা করিতে—অষ্টকের উদ্ধারের করিতে এবং সেজন্য নিজের প্রাণের বিপন্ন করিতে পারে নাই, তাহার অন্তঃবাসীর অবিচির ছিল না।
চুর্গমের সঙ্গীন

কিন্তু অস্তরবাহীর অবিদিত না থাকলেও চুর্গ তাহাকে পাইতে হইল—এবং বাহিরের প্রচুরবাহী অস্তরের অলঙ্কিত সজ্জাতে নিতাই বিষময় হইয়া উঠিতে লাগিল—আর ঠিক: এই সময়েই বীরেশ্বরের শ্রুত্র জানাতার হতে সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া চিঠিনিহিত হইলেন। তিনি বোধ হয় জানিতেও পারিলেন না। যে, যাহার হতে তিনি কষ্টা ও কষ্টা সম্পত্তির ভার দিয়া গেলেন—তাহার নিজের স্বাভাবিক সেদিন চুর্গহতের হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু জীবন তাহার যতই তার বোধ হতক—আর তাহার যতই চুর্গহত হইয়া থাকিকা: অনন্ত-পথ-যাত্রী কথ্যর সেদিন তাহার কঢ়ে নূতন ভার চাপাইলেন—সেদিন তাহার সহস্র্যীল কষ্টাকে পাতিয়া না দিয়া। বীরেশ্বর পোকের অবমাননা কিছুতেই করিতে পারিল না—যে স্বর্য নিজের ভার বহিতেই শিক্ষিত হইয়া পড়িতেছিল, তাহাতেই আবার নূতন ভার চাপাইলাম। লইল এবং শোক ও অকুল বেগ সেদিন পৃথিয়া না একেবারে কমিয়া গেল—সেদিন: পর্যায়-ঘন্টা বহুন করিতেও হইল। তারপর—সেদিন সংসার আবার নিয়ত নিয়মিত পথে চলিতে লাগিল—সেদিন সে ভুমিয়ার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহাদেরই এক দুর সম্পর্কীয় আচ্ছাদন তিনবারে উজারের জমিয়ারীর কার্যাধ্যক্ষ বিনু মরিয়া ছিল। ভুমিয়া বুঝিল, গরিমের ছেলে বীরেশ্বর জমিয়ারীর কার্যা বুঝিয়া না—আর বীরেশ্বর বুঝিল।
ফুর্গমের সঙ্গীনী

পরের সম্পত্তি একেবারে নিজের হাতে রাখিয়া নিজেকে ছোট করিব না—যাহা দুরে ছিল—তাহা দূরেই ধাকিয়া যাক ।

স্বামী ও ন্যায় এইরূপে যেদিন বাহির হইতে ক্রমশঃ অন্তরেও পরম্পরের কাছ হইতে দূরে গিয়া পড়িলেন—সেদিন বীরেখরের গৃহবাস অসহ হইয়াছে, আর হংসমাও স্বামীগণ প্রায় সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়াছে।

( ৩ )

কিন্তু ইহা অভিমান কি অপমান—বিহ্বাৎ কি বহি সুলিঙ্গ, বজ্র নির্জন না সত্যকার বজ, তাহা বুঝিবার আগে এবং কোনচিন্তা নাই, এবং পরিশ্রম হইবার সম্ভাবন। আঁছে কিনা তাহা অন্তমান করিবার আগেই সেই নব নির্মূখ কার্য্যাধাক্ষ তিনকড়ি যেদিন জমীদারী সংক্রান্ত কি একটা শক্ত লইয়া। কতকগুলা খাতা পড়িয়া প্রভৃতকেই প্রহার করিয়া বসিল—সেদিন চিরসংবাদ বীরেখর রায় এই একবার মাত্র সংযম হারাইয়া ধারাবাহিক ডাকিয়া তাহাকে উত্তররূপে প্রহার করাইয়া গৃহ বহিষ্কার করিয়া ছিল। কিন্তু
নুর্গমের সঙ্গীনী

পরগণায়ই গৃহকড়ী জমীদার-তনয়ার মুখবিকৃতি কর্না করিয়া। নিজের কার্যে নিজেই লাঞ্জিত হইয়া উঠিল—কারণ এ জমীদারী যে তাহার নয়—এই কথাটা ইমূহসার প্রতি আচরণের মধ্য দিয়াই অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিত—আর তাহা বোধ করি বীরেশ্বরের চোখে তত বেশী উজ্জ্বল হইয়া উঠিত না—যদি না ষেন্দরী প্রথম। নিতা নূতন প্রসাধনে নিজেকে জন্মার কন্ধার সাঝে লাজাইয়া তুলিত। যদি না তাহার দেহের উজ্জ্বলবর্ণ হইতে নীল সাড়ীও জ্যাকেটের প্রতি কমপ্লেক্স বলিতে চাহিত—যে সে ধনীর কথা—সে শাসনকর্তৃত্ব তাহার শাসন তোমরা মানিয়া লও।

কিন্তু সে যাহা হউক বী-গুহ্যর এই খুঁটি কর্মচারীকে এইরূপ শাসন না করিয়া কি করিতে পারিত। এই কর্মচারী তাহার অর্থ আত্মায় হইতে পারে এবং সে নিজে দরিদ্রের সম্বন্ধ হইতে পারে—কিন্তু সেদিন সে যে স্থানে আসিয়া বসিয়াছিল—সেদিন সেই সময়ের কর্মচারীর মাঝখানে তাহারই অধীনস্থ কর্মচারীর এই বেয়াদ্য, সহচার করিবে কি করিয়া। বী-গুহ্যর জমীদারের পুত্র ছিল না বলিয়াই এই খুঁটি কর্মচারীকে অধিকতর শাতি দিতে পারে নাই। কিন্তু বহুবুক তাহাতে সে বিয়াছিল, তাহারই জীব ও তাপমাত্রা যে অন্ধুর্ঘর উপরিতে হইতে—তাহাও জানিতে তাহার ..-কী ছিল না। কিন্তু সেদিন সত্যকারের শাসন কর্তার তেজ বীরেশ্বরের মধ্যে জাগিয়া।
দুর্গমের সঙ্গীনী

উঠিয়াছিল—তাই সেখানে দুঃখ ও দাঁড়ি আছে সেহান তাগ করিতে তাহার বিধামান ছিল না।

তাই তাহার মত উদার হস্ত র্বাঙ্গনের মত বিশিষ্টতেজ ছিল। সেদিন যখন সে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল—তখন শুখ ও শুধুমাত্র সমানভাবে উপেক্ষা করিবার জন্য হস্তের তাহার প্রস্তুত হইয়া গেল। তাই সংস্কার, সমান্ত করিয়া সামান্ত কিছু জলযোগ করিবার পরক্ষেই হৃদয়ের অপ্রাপ্তার্থ আঘাতও তাহার চমকিত করিল না। আর অন্য দিনের মত অন্তঃস্বাত্ত্বিক অভিমানের স্বভাবেই সে স্ত্রীর সহিত আলাপ করিল না। করিল হাস্যমুখে—নিবিড় শুখে ভরল করিয়া। লইবার শক্তিও স্বত্বে—অথবা সংজ্ঞ অথবা সরল স্পষ্ট ও নির্বিকার শুখে। হৃদয় যদি চক্ষু দক্ষিণ—স্মৃতিকে রুদ্ধিবার মত প্রেমে প্রাণ পূর্ণ ত্যাগিত—তাহা হইলে এই বেদনার ভরা, গুরুত্ব হাস্যে ভরা, গভীর শুধুমাত্র সহ করিবার পরিমাণে ভরা মহৎ প্রাণকে সে দুর্বিক্ষিত ভুল করিত না। কিন্তু স্বভাব অন্তঃস্বাত্ত্বিক সাধারণ রূপে ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না, বেদনার ভাব তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতেই পারিত না, সে ধীর কন্তা—সে আদর অভিমান দেখিয়াছে—আদেশ করিতে দেখিয়াছে ও শিখিয়াছে—বড় লোকের স্বাভাবিক অহংকারকেই আয়ত্ত করিয়াছে। মানুষের সত্য পরিচয় কোনখানে—সতীত্বের ও নারীত্বের যথার্থ বিকাশ কোনখানে—

9
ছুর্গমের সঙ্গীনী

তাহাতে আর পায় নাই বলিয়াই বোধ হয়—তাহাতে চোখে পড়ে নাই।

(৪)

তাই বীরেশ্বরের মুখ হাসি ও মধুর আলাপ তাহার চক্ষে তিনকড়িকে তাড়াইয়া দিবার অপরাধ ভঙ্গনের মিনতি ও করুণ বিলাপ বলিয়া বোধ হইল। সে পরম কঠো জিজ্ঞাসা। করিল “তিনকড়িকে তাড়িয়ে দেবার কি প্রয়োজন হ’য়েছিল?”

কিছুমাত্র ইতন্তঃ না। করিয়াই বীরেশ্বর বলিল “সে জমিদারকে অপমান ক’রেছিল।”

“জমিদারকে অপমান করিয়াছিল” বলিয়াই প্রথম মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ হাসিল।

কিন্তু তাহাতেও অক্ষেপ না। করিয়া বীরেশ্বর বলিল—“জমিদারও ইত্যাদি প্রতিনিধি একই জিনিস ব’লে জান্তাম—আজ থেকে সে ধারণা কি বললাতে হবে স্বীকার?”

“না—কিন্তু কে জমিদারের যোগ্য প্রতিনিধি সে সম্বন্ধে ধারণা একটু পরিবর্তন ক’লেও ভাল হয়।”

১০
গুরুমের সঙ্গীনী

একটি পরিহাস বৌরেখরের মুখ পর্যন্ত অস্পষ্ট ফিরিয়া ফেল। এই সমস্ত বিশ্বাস আলোচনার পর পরিহাস করিবার আর তাহার প্রত্যেক হইল না। সে অন্ত দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল “এই সমস্ত আলোচনাকে সত্যই কি খুব দরকার হ’য়েছে স্থ ঘনা ?”

“একটু হ’য়েছে এই জন্য যে, আমাদের আমাদের যারা, তারা জমীদারীর কাজ ভাল বোঝে তাদের ওরকম কথায় কথায় তাড়ানো উচিত নয়।”

বৌরেখর একবার মুখার মুখের দিকে চাহিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু চক্ষু ছইত। অর্থ পথ হইতেই ফিরিয়া ফেলিল। সে মুখার্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল “তুমি বোধ হয় শুনে ধাক্কাবে—যে, সে আমায় মেরেছিল।”

স্থ ঘন। তৎক্ষণাৎ উভয় দিন—হই। কিন্তু সে তাঁর জন্য তুর শান্তি পেয়েছে—তাঁকে ক্ষম করে ও চলত।

বৌরেখরের একবার ইচ্ছা হইল যে সে জিজ্ঞাসা। করিয়া লয় যে, তিনক্ষণের অপরাধটা স্থ ঘনার বিবেচনায় কতটা লম্ব এবং তাহাকে ক্ষম। করিবার জন্য সে এত ওকালতি করিতেছে কেন ? কিন্তু এই আলোচনার প্রারম্ভ হইতেই প্রতি পক্ষের উপর তাহার একটা ব্যতি মিশ্রিত অনুকূল। জগতি। উঠিয়াছিল—তাই সে সবকে এখন মাত্র না। করিয়া জিজ্ঞাসা। করিল “এখন কি কর্ত্তে হবে ?”

১১
ধূর্গমের সঙ্গীনী

স্থমাকে একটু যেন ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, ‘কাল, তাকে ডেকে পাও।’

“দশ বিশ টাকা মাইনেও বাড়িয়ে দেব কি একটা ইতস্ততঃ উত্তেজিত হইয়া। স্থমাকে বলিয়া উঠিল—‘তুমি কি মনে কর আমি এতক্ষণ তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছি।’

অতঃপর বিন্ধয়ের অভিনয় করিয়া বলিল,”আমিও ত’ কৈ ঠাট্টা করি নাই।”

স্থমাকে আর কথা কহিল না; বোধ হয় কথা কহিতে পারিতেছিল না। সে আরেক মুখে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল—আর দরজার পাশে গিয়াই কতকটা আদেশের সহিত বাগান, কাল তাকে ডেকে আনতে হবে—তা’বলে দিচ্ছি। ঈশ্বর হাস্য করিয়া বীরেশ্বর বলিল, “তুমিও ত’ ডেকে আনতে পার–তা’তে তার মানটা অনেক কেী বড়বে। তুমি যখন নিজেই জমায়েত।”

স্থমাকে আর দিকে খানিকক্ষণ এমনই দৃঢ়তে চাহিল—যে ক্রোধ নিচ্ছক গৃহা কি অঙ্কুরস্ত।—কি কোনটাই নয়—কিশোর উভয়েরই সাংস্কৃতিক তাহা বুঝা গেল না বটে—কিন্তু দৃষ্টি যেন বলিতেছিল—“ইহা—তোমার বড় স্পষ্ট যে—আচ্ছা বলিয়া লও—তোমাকে এর জন্য আর শান্তি দিব না, আমার যাহা করিবার তাহাই করিবই।”

তাহাও বুঝতে বীরেশ্বরের বাকী বালিল না। কিন্তু সে কোন কথা

১২
ধূর্গমের সঙ্কিনী

বিবর্তী আগেই জ্ঞান.. ঘরের ভিরু চুকিয়া তীক্ষ্ণ করে বলিল "আমি কি মান বাড়াবার কথাই বলুছি নাকি?"

সহসা বীরেন্দ্রের চক্ষু ঢুইট। যেন পাংশুবর্ণধারা কারি—নে বাম হতে তাহার মাথার চূলগুলো মুঁরা করি, ধরিয়া একটা ধূত দার্শনিকাস তাক করিতে করিতে বলিল—"না—অগ্রাম কর্কোর জন্য"—বলিয়া সে দৃঢ় হইতে উঠিয়া গেল।

( ৫ )

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া দিন বীরেন্দ্রকে পাওয়া গেল না—আর জমীদারীর কাজকর্মে দেখিতে জন্য তিনক্ষণে আনিতেও বিস্তার হইল না। বীরেন্দ্রের অন্তর্জান বাহার সমস্ত লোককেই সচকিত করিল। তুলিয়াছিল বটে, কিন্তু কেহই স্থাই করিল। কিন্তু জারিখার ঔৎসুক্যা প্রকাশ করিতে পারিল না—গৃহকর্তার সম্বন্ধে এ সব প্রশ্ন তুলিয়ার স্পষ্টতা ও কাহারও ছিল না—সাহসও কেহ করিত না, এত না। স্থতরাং সে সময়ে বিশেষ উচ্চ বাগা হইল না—আর বহুলিন অতীত চঠিরার পুরোকেই যাহা বিশেষ্যােপেই শৃৎ হইবার প্রয়োজন ছিল—তাহাই বিশ্বত হইতে লাগিল। সংসার কাহারও

১৩
দুর্গমের সঙ্গীনী

জন্ম অপেক্ষা করে না—আর মানুষের সেই সংসারের ছোট ও বড় বস্ত্র ভিন্ন কিছুই নেহ—তাহারাও কাহারও জন্ম চিরদিন আপনাভে করে না। সংসারের সব চেয়ে কঠিন সত্য স্বার্থ—তাহার পুটি হইলে মানুষ কি স্বচ্ছ ও প্রেমের অত্যন্ত অঞ্চল বিসর্জন করে কি মানুষের দুঃখ করে তা প্রেমের অভাবে অঞ্চল বিসর্জন করে তা কে জানে কি রকমের প্রেমের অভাবে অঞ্চল বিসর্জন করে তা কে জানে কি রকমের প্রেমের অভাবে অঞ্চল বিসর্জন করে না?

কিন্তু মানুষ যাহাই করকে আর বীরেন্দ্রকে অঞ্চল দুঃখেই বিস্মৃত হইয়া যাক—বিস্মৃত হইতে পারিলে কি শুধু স্বার্থ, আর তিনকড়ি। স্বার্থ বীরেন্দ্রকে তাহাকে পারিল না—বীরেন্দ্র তাহার স্বার্থ ছিল বস্ত্র হউক, কিন্তু প্রমাণের পুরুষে বীরেন্দ্র একত্রি নি 

স্বার্থ পত্র রাখিয়া গিয়াছিল তাহার জন্যই হউক। প্রতি প্রভাতে ও সন্ধ্যায় কোন না কোন আকার লইয়া বীরেন্দ্রের শ্রুতি মানসপটে ফুটিয়া উঠিতে—আর তাহার নীরব ভর্তৃহনা শান্তিকর্ত্রে মানস চক্ষে বিস্মৃত প্রমাণ হইবে কিন্তু প্রমাণ বাহি আর আনিত্বই—

তাহ। প্রেমের লাঞ্ছনায় হউক—কি যে উপেক্ষিত, সেই তাহাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছে সেই তাহাই হউক। হায়, মানুষের মন! সে যদি মানুষের আপনাই হইত—মানুষের যদি তাহাকে আপনাই করিতেই পারিতট—তাহ। হইলে পৃথিবী হইত' এতদিন মানবের কুলিত শর্করা পরিণত হইত—কিন্তু নরকের অত্যন্ত অন্ধকার কক্ষ রূপস্তরিত হইত। কিন্তু যে বিধাতা মানুষের স্থায়িত্ব করিয়াছিল, মনকে বুঝি সে শস্ত্র করে নাই, তাই মানুষ যখন পাপ করিতে

১৪
দুর্গমের সাঙ্গনী

সে দেখিতেছিল যে, এই বীরেশ্বরের উদ্ধানে তাহার পতন—আর
বীরেশ্বরের পতনে তাহার উদ্ধান সম্ভব হইয়াছে। বীরেশ্বর তাহাকে
অপমান করিয়াছিল বলিয়াই সে গৃহ-বিহিত হইয়াছে—আর তাহার
স্থানে তিনকড়িকে ডাকিয়া আনা হইয়াছে—বীরেশ্বর যদিও তাহাকে
অপমান না করিত—তাহা হইলে তাহার এই ঈশ্বর। সৌভাগ্য লাভ
হইত না। তাহার সে শক্ত হইলেও বীরেশ্বরকে মনে মনে ধর্মবাদ না
দিয়া ধীরে পারিল না। আর অত্যন্ত নিম্ন অন্তর, রিজেকে বীরেশ্বরের
প্রতিবাদী ভাবিয়া গৌরব বোধ করিতে দিল করিল না। কারণ গরীবের
ছেলে হইয়াও বীরেশ্বরের অধুন্তে যে শুক্তি শোভাগ্রের উদ্ধ হইয়াছিল—
তাহার একদিন গতি পরিবর্তন করিয়া
তাহার লাট্‌তেই জয় টাকা অগ্রিক করিয়া দিতে পারে—সম্ভব না
হউক এ ক্ষণ। করিতেও তাহার কোথাও বাধে নাই। সে চলনের
অংশনে চোরের মত লঙ্গী লাভ করিয়া আশায় উৎখল হইয়া
উঠিল।

আর তাই তাহার বিলাস এবং প্রসাধনের মাঝাটায় মাজ্জা। ছাড়িয়া
উঠিতে লাগিল—এবং সামাজ্য সামাজ্য কার্য লইয়া সে অক্সিজেনে
আহিয়া শ্রুতির সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিল; দুটি কবু হইলেও
tাহার লোকের দৃষ্ট অতিক্রম করিল না এবং তাহার দুই একটা
জীবাঙ্গের মত স্পষ্ট অধীনের কথাও বস্থন শ্রুতির কাছে উঠিল

۱۷
দুর্গমের সঙ্গীনী

এবং তাহাতে সে কোন বাধাও দিল না, তখন অন্য লোকের বিশ্বয়ের আর অবধি রহিল না। আর ঈশ্বরের হৃদয়নের মধ্যে যে একটা কিছু রহিল হইয়া গেছে—অপেক্ষকৃত হইলোকে সে কথাটা অপ্রকাশে আলোচনা করিতেও ছাড়িল না।

( ৬ )

কিন্তু এ সব বাহিরের কথা—ভিতর হইতে সৃষ্টা যে তিনকর্ণের পরিবর্তন একবারেই লক্ষ্য করে নাই—তাহা নহে। কিন্তু এই সব কুলে অভিযোগে দৃঢ়পাত ও কর্ণপাত করিবার মত মনের অবশ্য তাহার ছিল না। সে ইচ্ছা করিয়াই এই সব কোলাহল হইতে নির্লিপ্ত ধারিত চাহিত—বুঝিত না, যে তাহার এই অবহেলা ও নির্বংসাহ আর এক জনের স্পর্শ ও উৎসাহের অতি মাত্রায় বাড়িয়া দিতেছে—আর বাহিরে পদদাহাতে নিকৃষ্ট হইয়াও প্রকৃষ্ট কর্পচারী যাহার—তাহার। অত্যাচারে ও অন্যের আয়নায় অমঙ্গল বিস্ত্র হইতেছে। সৃষ্টির সংসারের অন্তরে ও বাহিরে তখন এই হই বিভিন্ন রকমের অশান্তি আসিয়া ভিতর হইতেই বেশ নাড়া দিতে লাগিল।

কিন্তু সংসার তখন দেখিবে কে? তখন যে সংসারীর মনের

১৮
চুর্গমের সঙ্গীনী

বনে আগুন লাগিয়াছে—তখনও অনুমতাপ হয় ত’ আসে নাই, কিন্তু বিবেকের পৃষ্ঠে কশাকাল পড়িয়াছে—আর যাহা হইয়া গেছে, তাহাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য আকুলতার ও অভাব হয় নাই। স্থানীয়ের ফিরিয়া পাইবার আর তাহার কাছে নতজাহাজ হইয়া কথা প্রার্থনা করিবার মত শক্তি ও প্রসন্নতা তখনও আসিয়া জুটে নাই বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে যে আচরণগুলা করা গিয়াছে, তাহাদের ফিরিয়া পাইবার আকাঙ্ক্ষা অবধি ছিল না।

তাই একদিক হইতে স্থষ্টমার জমাদারীর অংশ বিশেষে স্থানচুত হইতেছে, আর অপর দিক হইতে তিনকড়ির বাড়ী ঘরগুলী। নিত্য নিয়ত মাথা তুলিতেছে, তাহা অত সকলের দৃষ্টি অকর্ষণ করিলেও স্থষ্টমার দৃষ্টি অকর্ষণ করিল না। আর আকাশে ইঁথিতে বুঝাইলেও বুঝিল না দেখিয়া, বাহিরের লোক যাহারা তাহাদের মাথা বল্লে। কমিয়া আসিয়া, আর এই দুই নরনারীর মধ্যে যে একটা স্পষ্ট চুক্তি হইয়া গেছে, তাহাও বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। এমন কি সময়ে অসময়ে তিনকড়িকে জমাদারের ভিতর বাড়ী হইতে বাহির হইতে দেখিয়া সাধারণ লোকে যাহা বলিয়া থাকে তাহা বলিতে কেহ কোটি করিল না। আর ভিতর হইতে স্থষ্টমা গুনিতে না পাইলেও বাহির হইতে তিনকড়ির গুনিতে বাকী রহিল না যে, গ্রামের কোলেক্টরের। স্থষ্টমার আচরণে একেবারে বিশ্বিস্ত হইয়া গেছে,
দুর্গমের সঙ্গিনী

এবং এই ছুঁড়ী যে এই উদ্দেশ্যেই কানীটাকে বিদায় করিয়াছে—তাহার বুঝিয়ে এই ত্রিকালদেশী রোগী মণীলীর কাবারও বাকী নাই।

কারণ তাহাদের মধ্যে তাহাদের কেশগঞ্জ রোদতাপেই বোধ হয় পাকিয়া গেছে, তাহাদের নিজের কি করিয়াছেন বলা যায় না—
কিন্তু এমন ব্যাপার তাহাদের অনেক দেখিয়াছেন। আর ইহার ভিতরে যে কি কাণ্ড হইতেছে—তাহাতে তাহাদের ক্ষুদ্র গলির বলিয়া দিতে পারেন।

কিন্তু স্থূলম। জমীদার কথা। বলিয়াই হউক কি যে কথাটা তাহারা বলিতে পারেন—সে কথাটা তেহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে নাই বলিয়াই হউক—তাহাদের বিষ্ঠায় আর পরীক্ষা হইল না।

কিন্তু তাহাদের বিষ্ঠার পরীক্ষা হউক আর না হউক, এই সমস্ত কথা হইতে তিনকড়ির অনেক উপকার হইল। কারণ ইহার মধ্যে সত্য যতখানি তাহা। তাহার দৃষ্টির বাহিরে থাকিলেও ইহার মধ্যে অসত্য যাহা, তাহাকে সে পুরানাটন্ত্রীর উপসংহার করিল—কারণ তাহা আর কিছু না হউক, তিনকড়ির মহাপৌরুষের কথা, এ কথা বুঝিতে তাহার কিছুমাত্র ভুল হইল না। আর স্থূলম। তখন বাটীর ভিতরে থাকিলেও তাহার মুখ চোখ এ সংবাদে কতবাণী আনন্দে। জ্ঞান হইয়া উঠিয়ে তাহা কল্পনা করিয়া তিনকড়ি পরীক্ষাভব করিতেও ছাড়িল না।

বীরেশ্বর চলিয়া যাইবার পর প্রায় একবৎসর কাটিয়া গেছে।

২০
দুর্গমের সঙ্গীনী

এই নীর্ধ সময়ের মধ্যে খস্মার সংসারে সামাজিক পরিবর্তন হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার দেহ ও মনের পরিবর্তন তীর্থ দৃষ্টি না থাকিলেও লক্ষ করা যাইতে পারিত। আর সবার উপরে জমিদারীর পরিবর্তন ভিতরে ও বাহিরে কাহারও অবিদিত ছিল না। সেদিন তিনকড়ির স্পর্শ সীমা অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিয়াছে, আর অস্ত্র জমিদার কটার বৈরাগ্য না আসিলেও সংসারের উপর ও সাহে জমিদারীর উপর ভ্যানক বিরক্তি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কারণ নারীকে যাহা সম্বন্ধ খস্মার তাহার চেয়ে অনেক কেবল দূরে উঠিয়া পড়িয়াছিল—তাই এক বৎসর না যাইতেই তাহার উদ্যমের মেসেদে বেদনার আত্মাং পাওয়া গিয়াছে। বীরেশ্বর বর্তমানে যে ভার তাহারই সঙ্গে উঠত ছিল তাহাই তাহার প্রসারে খস্মার সঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছে। নারী স্বামীকে বিদায় করিতে পারে, অপচান্দ করিতে পারে, পুরুষাবতারে উঠিয়া সঙ্গে করিতে পারে—কিন্তু পুরুষের মত কর্ষশক্তি না পাইতে পারে না, তাই যে কোন দেশের যে কোন জাতির নারীই হউক না। এই সঙ্গে ভার খস্মার সেদিন বোঝা নাই যেদিন স্বামীর সঙ্গ তাহার অভাব অসহ হইয়াছিল, যেদিন তিনকড়িকে সমানিত করিবার জন্য স্বামীকে অপমান করিতে তাহার অত্রে বাহিরে কোথাও বাধে নাই।

২১
ছুর্গমের সঙ্গীনী

(৭)

কিন্তু সেদিন যাহা বাধে নাই আজ তাহা বাধিয়াছে—
সেদিন যাহা হস্তাধা তাহা গিয়াছিল কালের পেশনে সেইটাই হস্তাধা হইয়া উঠিয়াছে; আর শান্তি ও তৃপ্তি যেন জমের মতই বিদায় লইয়াছে। বীরেশ্বর বর্তমানে সামান্য দাসদাসীদের কলহ এক কথায় মিটিয়া যাইত; একটা মহীনায় সকলেই তপস্বি হইয়া উঠিত। আজ কিন্তু তাহাই এক সম্পাদে মিটে না তা গৃহকর্মী যতই শান্তি প্রদান করন। সর্বত্রই অভ্যন্তি, সর্বত্রই অপূর্বত।
সর্বত্রই নারীর শক্তিহীনতার লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সংসারে প্রকাও অথ আছে, প্রকাও রথ আছে, কেবল সারথী নাই; আর যে কি নাই তাহ হুঁড়িবারও সাধ্য কাহারও নাই।

এই অভাব এই অপুর্বত। জুর-দাঙ্গন করিত অপৃথমকেই; কারণ মন যতই অর্থীকার করক, মনের যাহা আসা সে যে ভিতর হইতে হঠাৎ দিয়া বলিয়া উঠে, যে, এই অভাবের মূলে ভোষার হাত নিষ্ঠায়ই আছে। আর মন অপরাধীর মত মাথা চূলকাইতে থাকে।

এইরূপেই যখন দিন যাইতেছিল, সেই সময়ই একদিন সন্ধ্যাবেলা তিনকড়ি কি একটা প্রশ্নেন জমিদার বাড়ীতে

২২
দুর্গমের সঙ্গিনী

আসিয়াই শুনল যে, শুধুমাত্র অত্যন্ত মাথা ধরিয়াছে; সে বৈকাল হইতেই শয়া তাগ করে নাই। এই পর্যন্ত শুনিয়াই তিনকড়ি একবারে শুধুমাত্র ঘরে আসিয়া। শুধুমাত্র পায়ে হাত দিয়া ডাকিল "শুধুমা"। বাহিরে তখন অদুরকার গাছ হইয়া উঠিয়াছিল, ধরিত্রীর কর্ম চাঁদগুল্ম ক্রমে শান্তি ও অবসানের মধ্যে ভুবিয়া যাইতেছিল, বাহিরে বাগানে হেলর ঝোড়ের স্বগ্ন বাতাসের গায়ে ধরিয়া রাখা যাইতেছিল না। আর শুধুমার অন্তরে তখন চিন্তারাশিও প্রায়ত্তের মেঝের মত ঘনাইয়া। আসিয়াছিল তাহাদের ও একুল ও কুল দেখা যাইতেছিল না। ঠিক এই সময়ে কাহার স্পর্শে শুধুমা চমকিত হইয়াই উঠিয়া বলিল আর পরক্ষণেই তিনকড়িকে সমুখে দেখিলা। কোথে জলিয়া উঠিয়া গ্রাম চীৎকার করিয়াই জিজ্ঞাসা করিল “তিনকড়ি যে—এখানে ?”

তিনকড়ি কতকটা খতমত খাইয়া বলিয়া উঠিল, বড় একটা জলেরি কাজ ছিল, শুন্য তোমার বড় অমুখ করেছে, তাই দেখতে এলাম—তাহার বলা শেষ না। হইতেই শুধুমা গর্জিয়া উঠিয়া বলিল “তাই এখানে আমার ঘরে ? আজ থেকে তোমায় বরখাস্ত করলাম, যাও!”। কিন্তু তিনকড়ি প্রায় কাঁদ কাঁদ ঘরে আপত্তি করিতে চাহিল, কিন্তু শুধুমা চীৎকার করিয়াই তাহাকে গৃহভূমায় করিতে আদেশ করিল। আর সেই চীৎকারে শুধুমার পরিচারিকা।

২৩
দুর্গমের সঙ্কিনী

বসন্ত আসিয়া। এই বাপার সমুখে দেখিয়া ভিতরে ভিতরে কাপিতে লাগিল, মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না; অথচ কতরী যে আজ তাহার রক্ত দর্শন করিবেন না এ বিষয়েও তাহার স্ত্রীর বিশাল কিছুমাত্র রহিল না।

কিন্তু তিনকড়ি চালিয়া গেলে দুর্ঘট তাহার পশ্চাতেই গৃহ হইতে নিষ্কাশ্য হইতে দেখিয়া উপস্থিত ঝঞ্চাট। কাটিল ভাবিয়া নে যখন একটু নিশ্চিন্ত হইবার কলন। করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ই দুর্ঘট পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত গন্ধের কঠে বলিল “বিবিসাহেব, তোমার এখানে আর পোষাবে না, কাল তোমার জ্ঞান পত্র শুইয়ে নিয়ে দেশে চলে যাও কিন্তু এখানে হয় যাও—এ বাটাইয়া আর চল্লেন।—বলিয়া বিছানায় গিয়া বসিয়াই আবার বলিয়া উঠিল—“আমার অন্তর হয়েছে বলে এখানে একটু বসতে পাবে না। বুঝি? একবারে মহলের বাইরে গিয়ে ইহারকি দিতে হবে করেছে? যাও দুর হ'য়ে যাও, দুর হ'য়ে যাও আমার সুমুখ থেকে।—বলিয়া বাহাকে দূর করিয়া। দিবার জন্ম সুখমা স্বচ্ছদ্বেই দরজা। বঞ্চ করিতে আসিতেছিল, দেখিল ঠিক সেই হত্তামাণি অস্তিকারে সুখমার গৃহতলে লুটাইয়া। পড়িযাছে—আর কুচ্ছ সুখমা না। দেখিয়া ঠিক তাহারই ঘাড়ে পা দিবামাত্রই পা ছুটি জড়াইয়া ধরিযাছে।

24
ছুর্গমের সজিনী

(৮)

এই বসন্তে ঠিক পরিচারিক। বলাও চলিত না—অথচ সব বলিলেও অভ্যস্ত হইত। কারণ এই হই সমুদয়ের একটা তাহাকে অপমান করিত, অপরটা তাহাকে অতিমানায় সমান দিত। কারণ বসন্ত জ্যোত্ত্বর পরিচারিকার মত থাকিলেও তাহার মত দরদী পরিচারিক। প্রায় দেখা যাইত না বলিয়াই জ্যোত্বর কখনও তাহাকে হীন কাজ করিতেও দিত না। কিন্তু শাসনটা চলিত সব চেয়ে বেশী এই বোচারী বসন্ত উপরেই; কারণ সদাস্বর্ণ সমুদ্রে থাকিত সেই, সতরং গৃহিনীর প্রাণ হইতে পদাযাত্রম প্রথম প্রাপ্য হইত তাহারই। তবু এই হই প্রভু ও ভূতের মধ্যে এমনই একটা সহজ সম্ভব আপনিই জ্যোত্বর ছিল—যাহ। অন্তের সহিত হওয়াও সহস্র ছিল না—আর হইলেও বিপরীত ফল ফলিত নিশ্চয়ই। এই জ্যোত্বর ভিতরে বাদ্যাভাঙ্গার মত তেজ ছিল—যাহ। বসন্ত ছাড়া সহিতে কেহই পারিত না। কারণ এই বাদ্যাভাঙ্গার অন্তের কোনু নিত্য শ্বায়র অক্ষ সজ্জিত আছে—তাহা এই বসন্ত ছাড়া আর কেহই জানিত না।

এই বসন্ত অত্র গৃহস্বরেই মেয়ে—সে জ্যোতিঃক্ষিত। না হইলেও অশ্রিক্ষিত। ছিলন।—আর নারীর যে গুণ থাকিলে তাহাকে পুজ্য।

২৫
দুর্গমের সঙ্গিনী

না করিয়া থাকা যায় না, সেই গুণ তাহার ভিতরে এতই কেশ ছিল যে স্থবিমার মত নারীতে তাহার গুণমুক্ত না হইয়া থাকিতে পারে নাই। প্রভু তাহাকে পদাধিকার করিলে বসত্র সহিষ্ণুতা বিচলিত হইত না—কারণ সে জানিত যে, প্রভুকে এই পদাধিকারের জন্য পরিতাপ করিতে হইবেই—আর সেই হইবে তাহার পুরস্কার। শক্তিমান শক্তি
হীনের আঘাতে প্রহর করিয়া। শক্তির অপব্যবহার বোধ হয় মাঝে মাঝে করিয়া। ফলে, কিন্তু তাহার জন্য তাহাকে অহংকার করিতে হয়—স্থমার আচরণে এ সত্যের বার্তার পরিক্ষা হইয়া গেছে।

তাই আজ তাহাকে ক্ষুদ্র দেখিয়া বসত্র স্থবিমার পা হঁসাহাই ধরিতে দিঙ্খ করে নাই—কারণ সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ভাঙ্গাটা যাহাই হইয়া থাকিল দোষটা স্থবিমার নিজেরই—নহিলে সে কথনও নহাতো রাগিয়া আঞ্জন হইত না। পরের দোষে ধন স্থবিমা রাগ করে—তখন সে এতটা লম্বাক্ষ করে না, বরং কতকটা নীরবেই শাষিত কর্তণ। করিয়া থাকে। কিন্তু নিজের অপরাধে যদি কথনও রাগ হইত—তাহা হইলে তাহার ক্রোধ অগ্নি কাহাকে ভষ্ম করিবে তাই হইল। এই লম্বাক্ষ অপরাধে অবধি থাকিত না। এই শিক্ষা আর কাহারও না হইয়া বসত্র হইয়াছিল। আর সেদিন বসত্র নিজেরও দোষ ছিল—সে গৃহ সম্বন্ধে প্রদীপ পর্যস্ত দেয় নাই এবং অস্ত্র স্থবিমার কা�ছেও বসে নাই।

২৬
দুর্গমের সঙ্কিনী

কিছু তাহার অপরাধ ভঙ্গ করে যখন পা ধরিয়া করিল—
আর স্থূলমারও তাহাতে কিছুমাত্র বলিবার শক্তি রহিল না—তখন সে অগত্যা শয্যাতেই ফিরিয়া। গেল—আর নিজের কোথায় আগন্তন নিজেই গজ্জিতে লাগিল।

কারণ আজকে সর্বপ্রথম স্থান। বুঝিতে পারিল যে, তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরস্ট হইয়াছে। নারীর শ্রেষ্ঠও বলিয়া যাহাকে চিরদিন বেলে সমান দিয়া আসিয়াছে—দারিদ্র বলিয়া। অত্যন্ত উপেক্ষা করিয়া তাহাকেই গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করা। যতই শক্তিমাতা এবং যতই ধনীর কথা। হউক—স্থূলবর্ণ যে অতিরিক্ত স্পর্শার প্রকাশ হইয়াছে, তাহ। বুঝিতে তাহার বেশী দিন বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু সেই স্পর্শার শান্তি যে আসিয়া পারে—তাহ। শান্তি না আসা পর্যন্ত বুঝিতে পারে নাই বলিয়া এতদিন অনুশোচনার পূর্ণ পরিষ্কার হয় নাই। কিন্তু সেই অনুগত শান্তি যেদিন আসিল—
আসিল তিনবার হত হইতেই অপমান রূপে, তখনই অক্ষর আসিল। কোথা আসিল—অনুশোচনা। আসিল—আর মন চীৎকার করিয়া কাতরগীর জাকিয়া লাগিল “কোথায় আজ তুমি দেবতা এস—তোমার ঘর যে কিছুতেই পূর্ণ করা যায় না।—
তোমার অভাব যে কিছু দিয়াই ভুলিয়া থাক। যায় না। নারীর অপরাধের জন্য নারীর ইষ্ট দেবতা তুমি রঞ্জ হইও না।”
চুর্গমের সন্নিধান

(৯)

কিন্তু হায় রে, ইহঁ দেবতা। যে তখন ইহঁশিদি করিবার পথ
হইতে বহুদূরে সৌর্যা গেছে—তখন যে নারীর কথা তাহার পাদমুলে
গৌরিবার পথ হইতে অনেক পিছাইয়া পড়িয়াছে।

তাহি নারীর কন্দন কন্দনেই শেষ হইল—অভীষ্ট ফল মিলিল না।
অন্নশোচনা। নিত্য দশ্য করিতেই লাগিল—তাপের শান্তি হইল না—
আর বৎসরের পর বৎসর স্থোমার মানসঃগৃহে মিলিন বেশে আসিয়া।
গৃহাভত হইতে লাগিল—আর তাহার সঙ্গে রূপের গৰ্ব্ব কৃমতার
মততা। শোকের আশ্চর্যন্ত পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল। কারণ
তাহারই গৃহে গৃহদেবতা। গোবিন্দের মন্দির প্রাঙ্গণে যখন কস্তোৎ
সেবে বাণীখবর ও কলোলিত উল্লাস সমস্ত গ্রামের পুরনারীবৃন্দকেই
ফাগের বর্ষে রক্ষণ করিয়া তুলিত—তখন স্থোমাই স্থু রিক্তের মত
পরিতের মত নির্জনে তাহার শ্বামীর গৃহাভাষ্যতে দাড়াইয়া তাহার
অজন। পথের পথিক শ্বামীর পরিত্যক্ত বসন-ভূষণগুলোর পানে
অভূষ্ঠ নয়নে চাহিয়া থাকিত।

বাহিরে তখন আনন্দ কোলাহলে গৃহ-প্রাঙ্গন ভরিয়া গেছে—
আর ভিতরে স্থূ উঞ্জ অক্রম নীরব, নীরব একেবারে স্বৈরব্যঃ—

২৮
চূর্ণের সম্প্রদায়

স্পর্শ-বিরহিত হইয়া সেই গৃহের গৃহিণীকেই অশ্রুজলে আকৃষ্ট করিয়াছে। তখন বাহিরে বাতাশ্বলীন পলকে পলকে শহরণ জাগাইয়া দিত, আর ভিতরে সারি সারি বারিকাদু কতনা পুলকময় স্বতিকে প্রতি পলকে অভিবিদ্রোহিত করিয়া দিত। আর ধরণীতে বসন্ত ও উপরে অনুভূত যিনি, তিনি ভিতর গৃহে যার আনন্দ উংসব সে গৃহের গৃহিণীর এই মনোবাদনের কথা—এই নিভৃতে অশ্রু বর্ষণের কথা কেহই জানিত না। কারণ বসন্তেও অন্য সমস্ত পরিচারিকারা উৎসব করিতে চলিয়া গেলেও যাইত না। কেবল বসন্ত এবং সেই শুভ অন্তরালে দাড়াইয়া স্মৃতিযুগভাবাত্মক লক্ষ্য করিত; অথচ সমুদ্রে আসিয়া কোন উপায়ে তাহাতে বাধা দিবার সুযোগ করিতে পারিতন—কারণ যতব্যত দরদাই সে হউক আর স্মৃতি তাহাকে যত্নবীন যতক্ষণ করক—এত বড় স্পর্শ সে কখনই সহ করিবে না। কিন্তু পরিচারিকা হইলেও বসন্ত অনেকে এমন একটা সমবাদনের ভাব জাগিত ছিল, যে এই প্রায়-সমবাদনী নারীর হস্তে তাহার অশ্রুর অভিজ্ঞ ব্যবহার হইত—তাই বসন্তেও হইয়া গেল একদিন সে স্মৃতিযুগ কাছে আসিয়া বলিল “রাগিমা, আমি একবারে তীর্থ যাত্রা করি—আমাকে ছুটি দেবার হকুম হোক।”

কথাটা শুনিয়াই স্মৃতিযুগ অর্থে মৃদুহাতে জাগিয়া উঠিয়াছিল—হাসিতে হাসিতেই সে বলিল—“তীর্থযাত্রা।” বলিয়াই কিছু পরক্ষণে

২৯
দুর্গমের সন্ধিনী

সে অভ্যন্ত অঞ্চলনক হইয়া গেল। যেন তাহার মন ঠিক এই সংসার, 
এই বাতি গৃহ উদ্ধার ছাড়িয়া সত্যই এক অজানিত তীর্থে চলিয়া 
গেছে। যেন ঠিক এই জিনিষটাই সে এতদিন অনুশীলন করিয়া 
আসিয়াছে, অথচ কোথাও পায় নাই—যেন এক অপূর্ব কষ্টরীয় 
প্রচণ্ড মদির-গঞ্জে সে এতকাল শুধু আকুল হইয়াই উঠিয়াছে—
কোথাও সেই হুল্ল বস্ত্র সন্ধান পায় নাই—যেন দেবমন্দিরে 
সন্ধারতির সমস্ত অল্পই স্মৃতিপথ হইয়াছে—শুধু হৃদভিধর্মি হয় 
নাই—তাহ দেবতাও শ্যামাগ্রহণ করেন নাই। আর আজ এতদিন 
পরে তাহার অনুশীলনস্থ হাড়ে বুঝি ঠিক সেই বস্ত্র সন্ধান 
পাইয়াছে—বুঝি নন্দননামের জীবিত। যন্তুক্ত স্থগন্ধ নাভি আজ 
তাহার করায় হইয়াছে—বুঝি দেবমন্দিরে বহু আকাঞ্জিত হৃদভিধর্মি 
জন্মে আজ ধরাপূঠৈ শোনা গিয়াছে—তাহ দেবতার মুখে হাস্য ও 
আনন্দের অধিক নাই।

তবু দৃষ্টম। নিজের মনে আজ যে বস্ত্র সন্ধান পাইল—তাহাকে 
গ্রহণ রাখিয়াই কপট গান্ধীব্যে উত্তর দিল “এই বললেই তীর্থবাজার।—
কিন্তু হ’দিন তেবে উত্তর দেব বস্ত্র, আজ এ কথা থাকু।”

দৃষ্টমাওর মনে যে হোপ লাগিয়াছে তাহা বুঝিয়াছিল বলিয়াই 
বস্ত্র জেদ করিয়া। বলিল “আমার ছুট্টা চাই রাগিয়া, ভেবে চিন্তে ‘না’ 
বললে চলবে না। আমাকে দয়া কর্তে হবে।”

৩০
"কেন বলু দেখি—দয়াটা। আমার কাছে বড় সন্তা হ'য়ে উঠেছে নাকি?"

বসন্ত হত ছুটা জোর করিয়া বলিল "কার কাছে তবে এ দয়া চাইব রাগিয়া—আমরা ত তোমারই"—বলিয়া। সে বোধ করি আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু স্বর্গ। তীক্ষকণ্ডে বলিয়া উঠিল "বসি, তুই যে আজ কাল খুব খোসামোড কচ্ছিস—কোথায় যাবি বলত? আর কোথাও চাক্কুই গেয়েছিস নাকি?"

"চাকুরীর জন্য ত’ আমার বুঝ হ'চ্ছেন।—তোমরা গরীব লোক পেলে ছুটা। কথা শুনি দিতে ত’ ছাড়ান।। তোমরা বড় লোক কোথাও ত’ যেতে চাওনা—বলিয়া। বসন্ত বোধ হয় অজ্ঞত যাইবার জন্য উঠিতেছিল—কিন্তু স্বর্গ। সহসা। তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া বলিল "তোর যে বড় স্পর্জ। হ'চ্ছে বসি—কি ব'ল্লি খুঁজে পাচ্ছিল না বুঝি?"

বসন্ত গলাটা একটু নামাইয়া বলিল "সতি যা, চলনা—তোমাকে নিয়ে দিনকতক ঘুরে আসি।—আমরা গরীব লোক পয়সা ধরচে করে। আর কত জায়গায় যাব?"

স্বর্গ। এই প্রেমে ইচ্ছিতে বেনন। বোধ করিয়াই মুখখানাকে একটু গভীর করিয়া বলিল সতি, আমারও একবার বেড়াতে যেতে ইচ্ছে হ'চ্ছে, দেখি—বলিয়া আরও অজ্ঞমনস্ক হইয়া গেল।

৩১
দুর্গমের সঙ্কিনী

বসন্ত তবু বলিতে ছাড়িল না যে, তাহাকে লইলে সে কুতুর্ক্ষ
হইয়া যাইবে—কিন্তু স্থিনা সে কথার আর কোন উত্তরই দিলনা।

স্থিনা সেদিন কোন উত্তর দিল না। বটে; কিন্তু তাহারই সম্ভাব
পরে সে স্বয়ং বসন্তকে লইয়। তার যাত্রার উদ্দেশ্যে বাহির
হইয়া পড়িল। কারণ গৃহ সেদিন আর গৃহ ছাড়ল না। অন্য
হইয়াছিল, আর অন্যের সেদিন সেই ডাক আসিয়া পৌছিয়াছিল
যাহাকে উপেক্ষা করিয়া মত শক্তি নারীর দেহ হইয়। স্থিনায়
কেন কোন রমণীরই ছিল না।

( ১০ )

এইরূপেই এই হইপ্রভু ও ভূত্ত্য সেদিন পরপরের অন্যান্য
অন্য বুধি লইয়। পথে বাহির হইল, সেদিন তাহাদের মধ্যে
বোধ করি সম্ভবেরও পরিবর্তন হইয়াছিল। কারণ স্থিনায় সঙ্গে
যে একজন মাত্র তত্ত্বা গিয়াছিল তাহাকে ছাড়িয়া দিলে আশাও
নেই। আনন্দ ও অবসাদে স্থিনায় উৎফুল্ল রাখিতে ও বিপদের
অপর মিশাইতে বসন্ত ভিন্ন আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না।

কিন্তু বসন্ত যাহ। মনে করিয়া পথে বাহির হইয়াছিল, অনেক
দিন এব অনেক দূর ভর্মণ করিয়াও যখন তাহা সিঁড় হইল না। তখন

৩২
দুর্গমের দশ্চিনী

সে শুধু অভিমান ছিল তাই হইল না; অত্যন্ত লজ্জিত হইল, এই ভাবিয়া যে স্থ্যম এতদিন গৃহ কোণে বসিয়া থাকিয়া হয়ত একস্থলে বাস ছিল; আজ তাহার পলায়িত শ্যামীর সন্ধানে তাহাকে পথে বাহির করিয়া এই বিরহিনী নারীকে বসন্ত বিরহের যে সত্যমূর্তি দেখাইয়া দিল, নৈরাজ্য-পীড়িত হয় লইয়া সে যখন গৃহপথে নির্ভর করিবে, তখনকার কোন রকম ও লজ্জা হয় হইতে তাহার প্রত্যক্ষে সে রক্ষা করিবে কে জানিয়া? আর এতদিন যাহার জীবন ও মৃত্যু সন্দেহের বিষয় ছিল, আজ অষ্টসন্ধানেও তাহাকে যখন পাওয়া গেল না, তখন যে তাহার মৃত্যু সন্দ্রবন্ধী অধিক, এ চিন্তা ত কিছুতেই রোধ করা যাহে না। এই হংসকে নৌকায় সে কেন দিল?

অথচ ইহায় যে তালই হইয়াছে, সুপরিচিত নারীর কুকাষ্ঠের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, ইহা ভাবিতেও তাহার মন সহচ বোধ করে নাই; শ্যামীকে অপমান করিবার প্রার্থনা যে কতকটা পাইতেই হইবে যে নারী শ্যামীকে একবার ভাল বাসিয়াছে সেই তাহার বিশেষীয়ী। তাই ভূত্য হইয়াও বসন্ত একটু আশ্চর্য নাস্তু লাভ করিয়াছি আর মনে মনে বলিতে ছিল, হে ভূগবান যাহা হইয়াছে তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত ও স্থূল অনেক করিয়াছে এতদিন শ্যামী থাকিতেও শ্যামীঞ্জনা হইয়া থাকৰ, ভূত্যের হস্তে অপমানিত হওয়া, আর

৩৩
ছুর্গমের সঙ্গীনী

সংসারে একাধু একাধু থাকা, নারী হইয়া পৃথে বঞ্চিত থাকা নারীর যতস্তুল হার্দুঃ তাহার সে ভোগ করিয়াছে, তাহাকে এইবার দয়া কর, তাহার প্রাণর সন্ধান দিয়া দাও, আমি প্রাণীহীন। বলিয়াই এই নারীকে দেখিয়া আমার বড় হৃদয় হয়।

আরাতে জয়সরিত হইয়াই স্থম। মানুষ চিনিতে শিখিয়াছিল তাই বসম যে তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসে—পরম্পরের মধ্যে অভ্যন্তালের দূঃ সম্পর্ক থাকিলেও এ সত্য। আবিষ্কার করিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। তাই অত্যন্ত অবসাদের সময় সে মাঝে মাঝে বসম তোমাও কাছে ভাবিয়া বলিয়া “বসম তোর এত মাথায় বাথা কেন বলতে পারিস, আমি' বেশ ছিলাম বাপু।”

স্থম। ও বসম স্মৃত যে দিন এই নেত্রোপিখিত আশার মাঝে দোল ঢাইতেছিল সেদিন তাহার। প্রাণের মুনিজন-সোবিত তীর্থভেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আর না। ও দানে পূজা ও অর্চনায় নিত্যানিত প্রাণের বেদন। প্রাণের প্রতু পদে অঙ্গিণি দিয়েছে। পথে সন্ধ্যাসী দেখিলে স্থমর কথা যাহাই হউক, বসম তাহার আপাধ- মনুষ্য নিরীক্ষণ না করিয়া ছাড়িত না; আর তাহারই অন্তরোধে কতোক দিন সন্ধ্যার ভোজন তাহাদের বাটীতে হইয়া গেছে; দয়া পাইয়ে না করিয়া হয় নাই। কিন্তু প্রার্থিত বসম প্রাপ্তির কোন আশা তখনও দেখা যায় নাই, তাই অশ্রুতের শান্তিও হয় নাই আর অর্ধেক করিবার বছ
ধূর্গমের সল্পিনী

� চেষ্টায় শ্রাপ্তিটি আসে নাই । কিন্তু নৈরাঘ্য তাহার অধিকার বৃদ্ধি
দিন দিন করিতেছিল বলিয়াই তাহার গৃহে ফিরিবার জঙ্গ প্রার্থ
প্রস্তুত হইতেছিল, আর যতদিন না শ্রাপ্তি আসে ততদিন থাকিয়া
যাইবার কলনাই করিতেছিল । কিন্তু যাওয়া বা থাকা কোনটাই
ভাল লাগিতেছিল না । চিত্ত শ্রুত চাওঁকারে কাঁদিয়া উঠিতেছিল।

কিন্তু পরিশেষে নারীর অনেকোঁ চেষ্টার সম্পূর্ণ অবশেষে, অক্ষরগলের
ভিতর দিয়া যেদিন যাওয়াই নিত্য হইল, আর জিনিষপত্র বাধাবীর্ধি
কোন কার্যাই বাকী রহিল না, সেদিন অতি প্রভূষায় উঠিয়া শ্রুষমা
বোধ করি তাহার পীড়িত চিত্তকে প্রজাত সমীরে একটি শুেঁশ করিয়া
লহির জয়ই জানালা খুলিয়া দিতেই দেখিল, নিশ্চার অবসান
হইয়াছে । প্রতীচির কার্গৃহে ভেদ করিয়া। প্রাচীর আকাশের নীল
বক্সে রক্ত শুরুর প্রথম অভ্যস্ত হইয়াছে ; আর তাহার অবাক্ষশ্ম-
সঙ্গে বিকাশে ধারণের বৃদ্ধি নদী ও দুর পর্বতে শ্রীনী স্বর্ণালোকে
ভাল উঠে । যেন জীবনের কোথাও অবস্থার নাই কেন বেদনা
হারাকার পীড়িতের অনুকে ও প্রশ্নের অত্যাচার নাই, যেন
পৃথিবীতে কোথাও মর্যাদাম নাই ; এখানে যাহা আছে তাহার সবই
মন্দ । অমৃদর যাহা ছিল, তাহার নিম্নশেষে অবসান হইয়াছে।

কিন্তু এই সময় বহিষ্কারে কাহার করতড়না শুনিতে পাইরাই
শুরু। নিজেই নীচে আসিয়া দেখিল যে, যে কুলি রস্পীটা নিত্য

৩৫
দুর্গমের সঙ্গীনী

আসিয়া তাহার অসঙ্গৃহ স্বামীর সেবার জন্য অর্থ ভিক্ষা করিয়া লইয়া যাইত, সে আসিয়া একবারে কাপ্তাকাটি লাগাইয়াছে। তাহাকে চূপ করিয়ে বলিয়া তাহার কৃদ্ধনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই সে বলিয়া যে তাহার স্বামীর অনুরাগ অত্যন্ত বাড়িয়াছে এবং শুষ্কাকে যায় করিয়া একবারে তাহাকে দেখিতে যাইতেই হইবে। কারণ তাহার স্বামী মরিয়া গেলে সে আর কিছুতেই প্রাণ রাখিবে না, দরিয়াতে বাঁধা দিয়া নিশ্চয় পাপপ্রাপণ বিসর্জন দিবে।

রমণী তাহার পাপপ্রাপণ বিসর্জন দিবে কি না সে বিষয়ে বিচার করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না বটে, কিন্তু এই নীচজাতিয়া নারীর অসুর্ভ স্বামী ভক্তি দেখিয়া ভক্তি ও বিশ্বাস শৃষ্ট। একবারে বিমূঢ় হইয়া গেল। তাহার বাহিরের দেহের তড় আবরণ সন্ধ্যায় হইতে চাহিল না বটে, কিন্তু মন এই অনার্থ নারীর পদতলে পড়িয়া লুটিতে লাগিল আর কৃদ্ধনেরক্ষরে বলিয়া লাগিল “ওগো সতী, আরও কিছু-দিন আগে আমার কাছে আসে না কেন?” তেজার কাছে আমার যে অনেক শিখিয়া ছিল। আজ—আজ রিক্তহস্তে গৃহ ফিরিতেছি। তেজার দেওয়া এই মহৎ শিক্ষা এ জন্মে আমার কাছে লাগিল না। যদি সংসার প্রাণ না হয় তাহা হইলে পর জন্মে আমি তেজার মত কুলি হইব—তেজার মত সতী হইব।” কিন্তু চক্ষু যে এই অবসরে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিল তাহার ধন ধার। সর্পে সে বুঝিতে পারিল তখন ৩৬
দুর্গমের সঙ্গীনী
কতকটা অগ্রান্ত হইয়াই সে উপরে চলিয়া গেল; আর একখানা শাল কাঁধে করিয়া একবারে দরোজায় আসিয়া ঢাকাইল। কিন্তু কি মনে হইতেই সে একবার বস্তুকে ডাক দিতেই দেখিল যে বস্তু তাহার ডাক দিবার পুর্বেই একখান। চাঁদ টানিয়া লইয়া তাহার পশ্চাতে আসিবার জন্য ডুতপাদে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছে। সে আসিলে স্থূমা আর কিছুমাত্র না বলিয়াই নিঃশ্চে পথে বাহির হইল। বস্তুত্ব নিঃশ্চে তাহার অনুশীলন করিল। কিন্তু কুলিরমণিটা কোপাইতে কোপাইতে বলিতে লাগিল যে একদিন কাঠ ভাঙিতে গিয়া তাহার স্থানী কিরূপে বুকে আঘাত পায় আর তাহ। হইতেই ক্রমে অর হইয়া সে এমন অবহ্যায় আসিয়াছে যে বোধ হয় তাহাকে আর বাইটান বাইবে না। ডাকার দেখাইতে সামর্থ্য তাহার নাই আর থাকিলেও ডাকার কি বলে তাহার বুঝিবার সামর্থ্য তাহার নাই হায় গো তাহার কি হইবে তোমরা মেয়া করিয়া তাহার প্রাণ বাইটান দাও।
কিন্তু তাহার প্রাণ বাইটান আগে তাহার স্থানীর প্রাণ বাইটান যে এলী দরকার তাহাই বলিয়া দৃতপদে স্থূমা কুটিয়া ধারে আসিয়া পৌঁছিয়াই দেখে যে কুটিয়া ভাঙিয়া যে লোকটি সত্যই অত্যন্ত অস্ত্র অবহ্যায় পড়িয়া আছে সে আর কেহই নহে তাহারই বহু আকাঙ্ক্ষিত স্থানী বীরেশ্বর রায়।

৩৭
দুর্গমের সঙ্গীনী

( ১১ )

নির্মেধ আকাশ হইতে সহসা বজ্রপতন হইলে মানুষ যতটা স্বভাবিত হয়, শ্রীযুত বোধ করি তাঁর চেয়ে কম বিস্মিত হয় নাই, তাই যে বেহে ও অন্য কোন লইয়া সে বিখ্যাতিরীর কুটার দ্বার পর্যন্ত ছুটিয়া আসিয়াছিল—তাহাই সহসা বজ্রে পরিণত হইল—সে কুটারের দ্বারে দাড়াইয়াই রমণীকে প্রথম করিল “এ তোমার স্থামী ?”

অত্যন্ত সরল তাবেই রমণী উভয় দিন “হামার, এ আমার জ্ঞানের জ্ঞান—আমার এই স্থামী।

শ্রীযুত চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইতে চাহিল—হা ভগবানু আর কত বড় শান্তি আমাকে দিবে—তাহার মত রাজমারীর রমণীকে একটা সামান্য কুলী রমণী তাহার মুখের উপর দাড়াইয়া বলে যে “এ আমার স্থামী।”

কিন্তু তাহারতই কোন উপায় ছিল না। সেখানে দাড়াইয়া আধুনিক পরিচয় দিতেও তাহার মাথা কাটা যাইতেছিল, অথচ এই রমণীর অসহনীয় স্পর্শায় অসহ হইয়া উঠিতেছিল। সে দাতে দাত চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিল “তোমাদের বিয়ে হয়েছিল ?”

“না না বিয়ে হবে কেন ?” বলিয়া কুলী রমণীটা মেধের মাঝে
ধুর্গমের সঙ্গীনী

বিজ্ঞলীর ছটার মত একবার হালিয়া উঠিল বলিল যে, ওর বো ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিল—পথে বেরিয়ে—এই পর্যন্ত বলিয়াই তাহার চক্ষু সজ্জন হইয়া উঠিল—রমণী গর্বভরে বলিল। উঠিল “আমি ওকে পথ থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি মা, ওকে বঁচিয়ে দাও।”

হায় রে, এই কুলী রমণী যদি জানিত যে, কাহাকে বঁচাইয়া দিবার কথা সে স্থথমাকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছে—কিন্তু সে কথা সে জানিত আর নাই। জানিত স্থথমার যে বলিবার কিছুই ছিল না তাহা যে শুধু অস্ত্যামীই জানিতেছিলেন। তাহি সে মনে মনে বলিতেছিল যে হে ভগবান এ আজ কি করিলে দয়াময়! যাহাকে ঝুঁজিবার জন্য সহস্র সন্তান তোজন করাইয়াছি, সল্যায়ীর গৃহে গৃহে সন্ধান করিয়াছি—আজ তাহাকে কি মূর্তিতে ফিরাইয়া দিলে গুরুত্ব? আজ কি তবে এই কুলী রমণীর সঙ্গে স্থায়ী লইয়া বিবাদ করিতে হইবে না কি? আমার অপরাধের শান্তি কি আর কোন রকমেই একটু লম্বু করা যাইতে পারিত না দয়াময়?

কিন্তু দয়াময় তাহার কার্য করিয়াছেন—তাহার কার্যের প্রতিবাদ ত’ স্থথমা করিতেই পারে না। কারণ সে যাহাকে উপেক্ষা করিয়া তার করিয়াছিল, আর একজন তাহাকে আদর করিয়া তুলিয়া লইয়াছে—ইহাতে বিধাতার অবিচারই বা হইয়াছে কোন খানে? আর স্থথমাই বা নালিশ করিবে কি স্পর্শয়?

৩৯
দুর্গমের সঙ্গীনী

কিন্তু আজ এতদিন পরে তাহার স্থানীয় উপর স্থায়ীর আবার অত্যন্ত রুশ। অন্যের গেল। এই আবার স্থানীর অন্যের আমি কত না অকৃষ্ট উপস্থাপন করিয়াছি? এই কি সেই নারীর দেবতা? যাহার জন্ম আমি সত্যিকারের দেবতার দিকেও ফিরিয়া চাই নাই? এই কি সেই দেবতা—যে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়েছে বামিয়া। আমি অথবা ভোজনে মৃত্তা পাই নাই? হা ভগবানু সত্য ও কলন। আমার সমান হয় না বটে, কিন্তু পরস্পর এত' বিরোধী হয় এত' কখনও দেখি নাই?

স্থোধার চক্ষে জল আসিয়াছিল কি না বলা যায় না—সে কুটার দ্বার হইতে ফিরিয়া পথে বাহির হইয়া ডাকিল “আর বসন্ত!”

কিন্তু এতেকন একেবারে প্রত্যহ পদতলে গিয়া ঢাকাইল। প্রভু তখন নিদ্রার যোগে কি রোগের যোগে অক্ষশ ছিলেন তাহা বুঝা গেল না, স্থোধার কি করিলে তাহাও বুঝিতে পারিতেছিল না। এমন সময় প্রভুপাদীর ডাক শুনিয়া সে অত্যন্ত বিমুখ হইয়া বাহিরে আসিয়া ঢাকাইল। অর প্রভুপাদীকে গমনোম্ভু দেখিয়া হের সংবত্ত হয় হাসি ও অন্ধ মিশান হয় রুঞ্জ ও বাঙ্গ মাখান হয়ে জিজ্ঞাসা করিল “দেবতার পায়ে মাটি লাগলে বুঝি পুজু করিয়ে নেই মা?”

স্থোধা পা ঢাকাইয়াছিল, সহসা স্থিত হইয়া ঢাকাইল। স্থায়ীর এই অবস্থায় দেখিয়া তাহার ব্যভাবাঙ্গত প্রচু অভিমানে যে যা
দুর্গমের সঙ্গিনী

পড়িয়াছিল, তাহারই পৃষ্ঠদেশে আর একটা থা পড়িল। ফিরিয়া গিয়া সে শ্যামীর শব্দার পাশে বসিল অর বসন্ত এই কথ্যথে সেই কুলী বন্ধুকে দিয়া একটা ডাকার ডাকাইতে পাঠাইয়া। দিয়া নিজে আসিয়া দুরে বসিল।

( ১২ )

পৃথকে যেদিন এই ভাবিয়া বীরেশ্বর পথে বাহির হইয়াছিল, সেদিন পথের ছাড় ও বেলনার কথা তাহার মনেই উঠে নাই। পথ যে কুলুমাষ্টুত নয় কন্টকাকীর্ণ, এসত্ত্বে বোধ হয় মাথারের কাছে অপরিচিত নহে। কিন্তু সে কণ্ঠক যে চরণেই মাত্র বিদ্ধ হয় অশ্রুককে শতক্ষণে করে না তাহার সেদিন তাহার ভাবিয়ার মধ্যে কারণ জগমিয়াছিল। তাই হঠাতে সে হঠাৎ বলিয়া কল্পনা করে নাই। কারণ তাহার প্রকৃতঃগুণ না দেখিলে সুধু কল্পনায় তাহাকে ধরিবার সাধ্য কাহারও নাই। তাই বীরেশ্বর পথে বাহির হইয়াছিল পথকেই সুধু অবলম্বন করিতে, অন্যত্র স্বজনের গৃহস্থার গিয়া আশ্রয় লইতে নাই।

কিন্তু পথে বাহির হইয়া আসিয়া প্রথম উত্তেজনায় যতভাব যাওয়া যায় তাহার যাওয়া হইয়া গেলে, যখন ভাবিয়ার সময় আসিয়া যে, জীবনে সে কোনো পথ গহন করিবে তাহার একটা শীত মৌমাংসা।
ছোটগোলের সঙ্গীনী

হওয়া প্রয়োজন, তখনই সমস্তা জটিল হইয়া আসিল। জীবনে তাহার বৈরাগ্য হয়ত’ আসিয়াছিল, কিন্তু বৈরাগ্যের বহির্বাস পরিয়া সাধু সাধিতে তাহার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি হইল না, আর গ্রাম ছাড়িয়া বনে গিয়া ঈশ্বরের দেওয়ান বনকলে উদরপূর্দি করিবার জুরায়কেরা ও তাহার কিছুমাত্র জাগিল না। সে সংসারের মানবের মতই বঁড়াইয়া ফিরিতে লাগিল। শুধু লম্বাহীন উদ্ধে বিহীন গ্রামায়িত পথিকের মত।

এমনই সময়ে একদিন একটা গ্রামে গ্রামে পাল হইয়া গ্রামের গ্রামে গ্রামে পালে বিবাহের উদ্দেশ্যে যাইতে যাইতে সহস। অত্যন্ত বৃহত্তে ভিজিয়া বীর্যকের জর হইল; আর যে গৃহস্থের গৃহভবারে গিয়া সে আশ্রয় ভিঞ্চা করিল তিনি বীরেশ্বরকে আশ্রয় দিতে ক্রটি করিলেন না বটে, কিন্তু এই অজানিত অতিথিকে তিনি কি চিত্ত দেখিলেন তাহা বীরেশ্বর বুঝিতে পারিল না। কিন্তু সে সমাজের ভিক্ষারী হইয়া যায় নাই, গিয়াছিল নিতান্ত আশ্রয় ভিক্ষারী হইয়া; কারণ সমাজ তখন তাহার প্রয়োজন ছিলনা।—আশ্রয়েরই প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু গৃহস্থার তাহাকে কোনটা দিলেন তাহাও বুঝিবার নতুন আশ্রয় তখন তাহার ছিল না। তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ই তখন আচ্ছান্ন হইয়া আসিতেছিল এবং আশ্রয় পাইবার পরক্ষেই তাহার চেতনা একবারে বিলুপ্ত হইল।

৪২
নগমের ঝিনী

তারপর সেই দিনই রাত্রি শেষে বীরেন্দ্র এমনই পেরিয়ে করিয়ে লাগিল যে, সেখানে তাহার কেহ আত্মীয় থাকিলে হয়তো কাদিয়াই সারা হইত। কিন্তু সে দিন হউক বীরেন্দ্রের সেই উদ্যোগ পেরিয়ে হই দিন পরে যখন একেবারে অবসান হইল এবং রোগীর দেহে জীবনের কক্ষ থাকিলেও চেতনার কক্ষ পাওয়া গেল না—তখন সেই বাটীর এক প্রভূত ভুত্তা বোধ করি প্রভুকে অকল্যাণের হাত হইতে বাধাইয়ার জন্যই—বীরেন্দ্রকে এক নদীতীরে ফেলিয়া রাখিয়া গেল।

কিন্তু ভূত্তা তাহার প্রভুকে অকল্যাণ হইতে রক্ষা করিলেও বীরেন্দ্র এই অকল্যাণময় পৃথিবী হইতে রক্ষা পাইল না—সে শশাঙ্গে বিশ্বাও জীবন লাভ করিল। আর তাহার চেতনা বিহীন দেহে যখন চৈতন্যের দ্বারা হইল, তখন বীরেশ্বরের অত্যন্ত কঠোর অর্থ হইয়াছে। সমুদ্রে সম্ভা বোধ করি তাহার জীবন সম্পর্কেই স্থান করিতে বহির্ভিতে নদীতীরের ঠাণ্ড। বাতাস অত্যন্ত অশ্বাস্ত কাপড় যিলে, আর তাহারই মাঝখানে বীরেশ্বর পাড়ি চালিয়াছিল, অনারুত ধরণীর বুকে, অনারুত আকাশের নীচে—নিঃশ্ব অসহায় বীরেশ্বর, সংসারের সকল স্থানে বঞ্চিত সর্বদিক হইতে বিতাড়িত। তখন গ্রীব জ্বরে তাহার আপাদ মস্তক কাপিয়াছিল, তথাপি একবার মাথা তুলিয়া বনাঞ্চলে কোন বৃক্ষের আশ্রয় লইবার জন্য সে ৪৩
ডুর্গমের সঙ্গীনী

উঠিয়ার চেষ্টা করিল। কিন্তু পা ও মাথার কোনটাকেই ঠিক রাখিতে না পারিয়া তিন তিনবার ধরাশায়ী হইল। তার পর অক্ষপূর্ণ চক্ষে আকাশের দিকে চাহিয়া। বলিয়া উঠিল “ভগবানেই এইখানেই আমার স্থান নির্দেশ কলের প্রভু? ” এবং পরক্ষণেই পুনরায় মুছিত হইয়া গম্ভীর। আর রাত্রি তাহার চারিদিকে গভীর কালোমুখী লইয়া ঘিরিয়া ধরিল, নদীতীর নিবিড় আঁধারে আচ্ছন্ন হইল।

বীরেন্দ্র ভগবানকে ডাকিয়া চূপ করিল বটে, কিন্তু সেই জননায়-পরিত্যাগ শ্রদ্ধান, সেই গভীর বনরাজি-বিবাজিত প্রান্তের মাঝামাঝি মানুষই তাহাতে পারে না, তা ভগবান থাকিবেন কি করিয়া? ভগবান ছিলেন না বটে, কিন্তু এই বিশ্ব সংসারটা পৃথিবীর যাতের নরনায়ী ও পশুপক্ষী লইয়া নাকি তাহারই নিজের রচনা, তাই স্বয়ং উপস্থিত না থাকিলেও দৃষ্টি। তাহার নির্জন নদীতীরেও নিক্ষিপ্ত হইয়া ছিল, আর মরণোদ্ধে বীরেন্দ্রের শেষ করণ আঁধার লক্ষ্যভূত হয় নাই, ভগবানের কর্ণে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। তাই বীরেন্দ্র প্রভুকে ডাকিয়া যখন প্রভুর পদতলে পৌঁছিয়ার জন্যই যাত। করিল—ঠিক তখনই সেই বিজ্ঞন বন হইতে এক বিজ্ঞনীয়। আসিয়া তাহার শিয়রে বসিল। বোধ করিলে বন পথ দিয়া কোথাও সাইতেছিল ‘আর মন তাহার হয়ত’ অভ্যস্ত বিষাদে ও বেদনায় পৃথিবীর পাথরব
দুর্গমের সঙ্গীনী

জীবনের উপর নির্ধর হইয়া উঠিয়াছিল—তাই এই নির্জন নদীতীরে শ্মশানের মাঝখানে সন্ধ্যার অন্ধকারে মৃতপ্রায় বীরেশ্বরকে জীবিত ভাবিতে ও জীবনের উপকূলে তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে একাকিনী রমণীর কোথাও বাধিল না। সে বীরেশ্বরের অবস্থা একবার মাত্র দেখিয়াই দূরে পল্লীবাসকের যেখানে আঁং আঁলাইয়া খেলা করিতে-ছিল, সেখানে ছুটিয়া গিয়া তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু সহসা এক রমণীকে অন্ধকার হইতে আলোকে আসিয়া উপস্থিত হইতে দেখিয়া তাহাকে প্রেতিতি ভাবিয়া সকলেই যখন পলায়ন করিল, তখন অগত্যা সে ধারিত। অগ্নি লইয়া আসিয়া বীরেশ্বরের হাতে ও পায়ে অগ্নির উত্তাপ দিতে লাগিল।

প্রায় এককটা ধরিয়া অগ্নির উত্তাপ দিয়া। যখন রোগীর চেতনা ফিরিয়া আসিল তখন সে মাত্র একটা দীর্ঘ নিংখোস ফেলিয়া। পাশ ফিরিয়া শুইল, কিন্তু পরক্ষণেই পদতলে অগ্নির উত্তাপ অন্ধভব করিয়াই সে উঠিয়া বসিল এবং সেই সময় জীবন অন্ধকারে মাঠের মধ্যে পড়িয়া আছে রুষিতে পারিয়াই বোধ হয় শ্রান্তিতেই চক্ষু রুষিতে ছিল কিন্তু এই সময় তাহার গুরুবাকারিণী জিজ্ঞাসা। করিল বাবু উঠিতে পারিলেন?

বাবু যেন কতকটা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা। করিল হুমি কে?

রমণী একটু হাসিয়াই উত্তর করিল “আমি ত তোমাকে...”

৪৫
দুর্গমের সঙ্গীনী

বাঁচিয়েছি, ওঠ, আমার কাঙে ভর দিয়ে চল। বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া টাঁটিতেই বীরের উঠিয়া টাড়াইল। কিন্তু পায়ে ভর দিয়া টাড়াইতে পারিল না, রমণীর কাঙের উপর তাহার মাথাটা। লুটাইয়া পড়িল। কিন্তু সে শক্তির তাহার জোর করিয়া ধরিয়া বলিল নেই বারু পায়ে হেঁটে চল, কাছেই একটা ভাঙ্গা কুড়ি আছে সেইখানেই আজ রাত্রি কাটাব চল।

বীরের সাহার সেই ও প্রেম মাখান মুখের দিকে একবার চাহিল; চাহিয়াই সেজা হইয়া টাড়াইল আর অত্যন্ত মুখের বলিল “চল” বলিয়া ধীরপদে সেই মৃত্যুর উপকূল তাগ করিয়া গেল; ধনীর উপেক্ষিত মূল কাঙ্গালিনী কুড়াইলা লইয়া গেল।

( ১৩ )

তারপর বীরের যে দিন শহ্স হইয়া উঠিয়া বসিল সে দিন তাহার জীবনের এক নতুন শিক্ষা হইয়া গেছে। জীবনের এক মসীলিত অধ্যায় শেষ করিয়া আসিয়া সে আর এক নতুন অধ্যায়ে পদার্পণ করিয়াছে। সে দিন তাহার চোখে পৃথিবীতে তাহার কোন আত্মীয় নাই—পৃথিবীতে তাহার কোন কর্ষন্য নাই—তখন তাহার জবন বেদনাহীন শ্রদ্ধা ও শান্তিময় হইয়াছে। তখন সে ইঞ্জার ।

৪৬
মুর্গমের সঙ্গিনী

করিলে হয়ত’ দেবর্কাস্নাও করিতে পারে কিশো। পশ্চ শীকার করিয়াও জীবন কাটাইয়া দিতে পারে। কারণ সে ভাবিয়া দেখিল যে জীবনে তাহার উৎসব কখনও আরস্ত হয় নাই—স্বতঃসং ছন্দোহারা হইবার ও ভয় নাই। পথেই তাহার জীবন কাটিয়াছে, হয়ত’ পথেই কাটিবে। এই পথ হইতেই তাহাকে একজন কুড়াইয়া নাইয়া গিয়াছিল, গিয়া হ্রদিন আদরও করিয়াছিল। কিন্তু তাহার সথ মিটিয়াছে, সে দূর করিয়া দিয়াছে—আজে আবার একজন তাহাকে পথ হইতে—মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছে, আর যতদিন না তাহার সথ মিটে, ততদিন সে নিশ্চয়ই তাড়াইয়া দিবেন। আর যদি বীরেশ্বরের জীবনের সাথ ও সথের শেষ হইয়া থাকে—তাহা হইলে হয়ত’ সে আগেই চলিয়া যাইতে পারিবে। তবে আর তাহার মূহ করিয়া কি আছে? সে একদিন ধনী না হইয়াও ধনীর বিলাসে কাটাইয়া আসিয়াছে, আজ সে তাহার সত্যকার অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়া হঘঘ করিবে কিসের জন্য? শক্তিমান পরমেশ্বরের জন্য হউক, সে এই খানেই নিশ্চিত হইয়া বসিয়া থাকিবে। আর যত দিন না মৃত্যু আসিয়া তাহার জড়দেহকে স্থানান্তরিত করিতে চায় ততদিন আর এখান হইতে নড়িবে না।

কিন্তু পরিবর্তন যে মাঞ্ছের স্বভাব-জাত-সংস্কার; নিজের আলোচ ও নিষ্পেষিতা তাহাকে যতই আবদ্ধ করিয়া রাখিব, প্রাণে যে পরিবর্তনের
হুর্গমের সঙ্গিনী

অভাব গ্রাণকে আকুল করিয়া তুলে, তাহার শাসন ত’ মাঝের দেহ মন লইয়া অমান্য করা চলে না। তাই বীরেশ্বরও কিছুদিন একস্থানে অবস্থান করার পরে সেদিন স্থান পরিবর্তনের জন্য অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল, সেদিন বীরেশ্বরের পত্নী স্থমা স্মার্তী সঙ্গানে পথে বাহির হইয়াছে। কিন্তু এই হই একই মৃত্যু ধ্বংসতা নরনারীর মধ্যে সেদিন এমনই অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছিল যে, একজন যখন চলিত অষ্ট, যান, নিজের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রক্ষা করিয়া, ইতরদের সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিয়া, আর একজন তখন চলিত পদব্রজে, ক্রীত দেহে, ইতর ও ইতর জাতীয়দের সঙ্গে, তাহদের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ থাকিয়া। একজন যখন থাকিত প্রাঙ্গণে—অট্রেলিকায়, ভাস্ত্রলীতে, অপরজন তখন থাকিত কুটায়, পথনাটে, ইতর পল্লীর অতি সন্ন্যাস হানে। আর হয়তো এই হই পরম আশ্রীয়ের চরমকালেও দেখা হইত না—যদি বীরেশ্বর প্রয়াগের পথে আসিয়া পীড়িত হইয়া না পড়িত, আর বিপথ কুলী রমণী অনন্তাপূর্ণ হইয়া ঠিক স্থমায় গৃহনামীর হাত পাতিয়া না জাড়াইত।

কিন্তু সে যেমনই হউক এই অস্থায়িত মিলন এক দিন হইল, কিন্তু সেদিন স্থমা ও বীরেশ্বরের মধ্যে প্রফুল্ল লেখা আসিয়া পড়িয়াছে তাহাকে অতিক্রম করিয়া সাহস ও স্পৃহা। কোন পক্ষেরই ছিল না—কারণ স্থমা যাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিল তাহাকে আর.
হুর্গমের সঙ্কিনীতি

এক জনের আলিঙ্গন হইতে কাড়িয়া লওয়ার স্পর্শ। তাহার খাকিতেই পারে না; আর পথে যে পরম সেবে সৃষ্টির কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিল তাহাকে তায় করিয়া বীরের পুকুরখ ও মদ্যপাত বিস্মরণ দিবে—মুখমার সঙ্গে বন্ধনটা ধর্মের বন্ধন হইলেও ততটা শক্তি সেদিন আর তাহার ছিল না।

তাহি কয়েকদিন সেবা শুভ্রধার পর বীরের রোগশয্যা। তায় করিয়া উঠিয়া। বসিয়াই মুখমা ও সস্তকে দেখিয়াই যখন অতিমাত্র বিষমে জিজ্ঞাসা করিল তেমনই তখন মুখমা শুধু মাত্র একটা কাড়িয়াছিল—এর কোন উত্তরই দিতে পারে নাই। কিন্তু বসন্তের কথা প্রভুর পদে নিবেদন করিয়া যখন প্রভুর ইচ্ছা জানিতে চাহিল—তখন প্রভু শুধু একটা হাসিলেন মাত্র। তাহার কিছু বন তখন থাকিয়া বলিলেন আমি এত নৌচেপ গেছি বলকে তোমাদের বাড়ির উঠানে পা দিতে আমার আর সাহস নেই। আমাকেই খোঁজবার জন্য যদি এসে থাক ত’ ফিরে যাও।

বসন্তের অভ্যন্ত কুম্ভ হইয়া বারংবার শিরস্সঞ্চালন করিয়া বলিল তাহ’ তেই পারে না—আমার এত কষ্টে যখন আপনাকে খুঁজে পেয়েছি, তখন আর ছেড়ে যেতে পারব না।

মহু হাসিয়া বীরের তাহার নূতন সঙ্কিনীর দিকে অনুবির্জন করিয়া বলিল, আমি ত একে ছেড়ে যেতে পারি না।

৪৯
হুর্গমের সঙ্কর্নি

“তা ওকেও সঙ্কর নিয়ে চলুন।”

গন্তীর হইয়া বীরেষর বলিল তাঁ’ হয় না। বসমতী—হেতু যে জ্যোতির্ভাবে আমি তাগ করে এসেছি সেখানে আমি মৃত। আমাকে মৃতজ্ঞ পনা তোমরা তোমাদের পথ প্রশস্ত করে নাও। ও আমায় যে ভাবে বাচিয়েছে—সে যে কি করে অন্তর হয়েছিল তা’ জানি।—আর বোধ হয় ওর মত করে তাল বাসতে না পালে সে কাজ সত্ত্ব হয় না। আমি আজ আর পাপপুণ্য মানি না বের—কিন্তু ওকে তাগ করায় যে কত বড় পাপ হবে—তা’ আমি কল্পনাও করে পারি না।

কুলী রমলদা এতক্ষণ দুঃখে বাসযাত্রা ছিল—এই সময় সে বুঝি আসিয়া বলিল ‘বাখু, তোমার বাড়ী যাও, আমি অবার কয়লার ধনিতে কাজ করে যাব’ বলিয়া ধন ধন চক্র মুছিয়ে লাগিল।

কিন্তু বাখু তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল ‘নৌকে মুনয়া, আমার কি আর যাবার কেল আছে? আমি যে এখন কুলী হয়ে গেছি—আমায় ওরা জাতে নেবে কেন? তুই যা’ তোর কাজ করে গে। আমি কোথাও যাব না।”

মুনমুলার এই সব দৃশ্যমান। মোটেই ভাল লাগিতেছিল না, কিন্তু পাছে বাখু চলতীয়া যায় সেই ভয়ে স্বানত্বাগ্র করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু বাখু যে কুলী হইয়া গিয়াছে আর তাহাকে তাহার ।

৫০
ছুর্গমের সঙ্গীনী

আত্রায়েরা হাতে লাইবে না তুমি। সে: কতকটা নিশ্চিত হইয়াই সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

সে উঠিয়া গেলে স্বষ্টা আসিয়া স্বামীর পদতলে প্রশাম করিয়া বলিল, তোমাকে আমি অপমান করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তার জন্য আমিও অল্প দৃঢ় পাই নাই। তুমি যার কাছে যেখানে থাকলে বেঁচে থাকবে সেখানেই থাকো; আমি গুহু মাঝে মাঝে এসে এই তীর্থে তোমায় দেখে যাব। এই অধিকার থেকে আমায় বঞ্চিত কর না— বলিতে বলিতে তাহার স্বর গাঢ়। উঠিল। বসন্ত দূরে বসিয়া কাদিতেছিল, বীরেন্দ্র সাহায্যের কন্ধন দেখিয়া নিজেও কাদিয়া কেলিল। কিন্তু পরক্ষণেই অন্যসহ্রণ করিয়া বলিল, "আচ্ছা এসে। অধিকার আমি তোমায় কোন দিনই দিই নাই, কোন দিন বঞ্চিত কর না।"

বসন্ত কাদিয়া কাদিয়া চক্ষে লাল করিয়া শেষে বলিল "আমরা শীতের ফিরে আসব বাবা, তুমি যেন এখান থেকে আর পালিও না।" অত্যন্ত ক্ষীণ হারি হারিয়া বীরেন্দ্র বলিল, "না বসন্ত, আমি যে কুটিয়ার দিন বেঁচে থাকবে রোধ হয় আমায় এইখানেই থাকতে হবে।"

৫১
ধুর্গমের সঙ্গীনী

(১৫)

স্থযমা ও বসন্ত চলিয়া গেল। প্রাণকে পঞ্চাটে ফেলিয়া দেছে যে ভাবে চলিয়া যায়, সেই ভাবেই এই ছই নারী চলিয়া গেল—অব হতভাগিনী স্থযমা বাংবার অশ্রুপূর্ণ নেত্রে স্নায়ীর কুটীরের দিকে চােচিতে লাগিল—বুঝি তাহার মনে হইতেছিল যে, তাহার সেই দয়ায় স্নায়ী বোধ হয় এত নিষ্ঠুর হইবেন না—বোধ হয় তাহার পঞ্চাটে তিনিও আসিতেছেন। কিন্তু তবারই তাহার দৃষ্টি নিরাশ হইয়া ফিরিলা। আসিতেছিল—তবারই অক্ষ দ্বিঘুণ হইয়া সমুখের পথ অদৃশ্য করিয়া দিতেছিল—আর মনে হইতেছিল যে, ওবে হতভাগিনী, তেঁর যে সমুখে পথ নাই—পথ যাহা তাহাত’ তোর পঞ্চাটেই রহিয়া গেল।

কিন্তু তাহার এই অবস্থা দেখিয়াই বোধ হয়, বসন্ত আসিয়া তাহার হাত ধরিল, আর প্রায় জোর করিয়াই তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। কিন্তু যে মুহূর্তে কুটরখানি তাহাদের দৃষ্টির বাহিরে বনামটলে আছি হইল, সেই মুহূর্তেই তাহারা পথের উপর বাসিয়াই আকুল কন্দনে পরম্পরকে জড়াইয়া ধরিল।

আর বীরেশ্বর তাহার দ্বন্দ্বলকে বিদায় করিয়া দিয়া যে বেরণা ও পৌরবের জোরেই বাহিরে প্রকাশ হইতে দেয় নাই—স্থষ্মাঙ্গ ৫২
দুর্গমের সন্ধ্যা

বসন্তের পদরেখা দুই পথে মন্ত্রণ হইতেই তাহারই তারে
একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল; আর চক্ষের জলবিদ্বংসাপারে
পুনঃপুনঃ মুছিয়ে মুছিয়ে বলিতে লাগিল “ওগো প্রিয়া, আজ তোমার
নালিয়ের যে অপমান করিলাম, তাহ। শুধু আর এক নারীর মান
রাখিবার জন্য, তাহ। তেন তুলিও না— তুলিয়া আমাকে কাপুরুষ মনে
করিও না—তুমি অনেক অপমান করিয়াছিলে বেলে—কিন্তু তোমার
আহানে আজ আর নীরব থাকিতে না; কিন্তু তাহ। হইলে তালত
বাসার মর্যাদাতে রাশি হইত না, তুমি আমায় মার্জনা করিও।”

কিন্তু মুখ্য তাহার কর্জন করক আর নাই করকে, যেহেতু
এই বিদায়ে দেওয়া ও নেওয়ার কার্য শেষ হইয়া। গেছে, আর মুখ্য
দুই দাত্ত তাহার মার্জনা করক কি না করকে, তাহ। বীরেন্দ্রকে
সন্তান করিতে পারিবে না। তাহাও সত্য, তবু আজ এই বিদায়
দেওয়াকে উপলক্ষ করিয়া অতীত ও বর্তমানের জন্যে বাধি দুঃখগুণ্ডার
মাঝখানে যে একট। মন্তব্য বাধায়ের স্থটি হইল, তাহার অমুসৃষ্টাব্জ
দুঃখ-কলনকে শুধু চোখের জল দিয়া রোধ কর। যাইতেছিল ন।
টাই বীরেন্দ্র তাবিদিতেছিল যে এ স্বতি মিঘ্র হইত, জীবনের এই যে
এই দিনকার দুঃখ কষ্ট প্রাপ্তি ও মান অভিমানের সমস্ত ব্যাপারকার
মর্যাদা হইত— তাহ। হইলে এই বিদায়ট। সত্য্কারের অশ্রুঘনের
ভিতর দিয়া। জনমের মত বিদায়। ন। হইয়া, আনন্দাশ্রে ভিতর দিয়া

৫৩
চুনীমের সঙ্গীনী

একটা নিবিড় আলিঙ্গন হইত—আর বক্ষে বক্ষ স্পর্শের আনন্দ স্মৃতির সমস্ত নিরাময়ের একসঙ্গে অবসান করিয়া দিত। আর—আর কিছু না হউক স্থবিয়াকে সঙ্গল চক্ষে ফিরিয়া যাইতে হইত না—'অপরাধীধিনী হইলেও সে যে তাহার শ্রী তাহার অশ্রুর ভিতরিতি—

ধর্ষণধী—

কিন্তু ঠিক এই সময়ই দূর হইতে মুমিনাকে আসিতে দেখিয়া সে মনে মনে হাসিয়া উঠিল, আর মনেই বলিতে লাগিল কে কার শ্রী আমি কুলী, দীন দরিদ্র কুলী—ভগবানে আর সন্দেহ থেকিলো না। প্রভু! অতীতকে তোমার পদপ্রাপ্তে ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছি—আর মে পথে যাইতেছি সে পথ মনেই হউক, আর তাহার শেষে অত্যন্ত শান্তি থাকুক কি নয় শাকুক, সেখানে গিয়া যেন একটা অকৃত দীর্ঘ নিদ্রায় অবসর পাই, যেন অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভুবাইয়া দিয়া। প্রকাশ এক মহামৃত্যুর মাঝে ভূবিয়া যাই।

৫৪
( ১৬ )

শুধু সঙ্গল চোখে নয়, সারাপথ কাঁদিতে কাঁদিতেই শ্যুমা শুধু গৃহে ফিরিল। শুধুগৃহে একবারে উৎসর্গীতি-গৃহ—গ্রামও জগৎকের চীন-পরিসীমা। এই আশাবন্ধ কারাগৃহে অধিকতর শুধু মন লইয়া ঘর করা যে কতবড় শান্তি তা অবহার না পড়িলে কি পুরুষ কি নারী কাহারও বুখিবার সাধ্য নাই। শুধু তাই নয়, এই অম্বার- গৃহ জীবন লইয়া জমীদারর যে, আবরণ তাহাকে আঁকুঁর রক্ষা করিতে হইতেছে, তাহাই তাহাকে অন্তরে অন্তরে পীড়িত করিতেছিল। এই যে আঁকুঁর এই গৃহের চারিপার্শ্বে কদম্বের শীর্ষ ও বকুলের স্বর্ণশি নিয়া এই গৃহের অধিবাসী সমস্ত নরনারীর ইক্তিয়কেই সহেত করিয়া দিয়া যায়, ইহায়ে তাহারই সহেতে রোপিত—যাহাকে এই গৃহে গৃহশীর্ষে হইতে জোর করিয়া বস্তিত করা হইয়াছে, তাহ। যতই মনে হয়, মন যেন ততই অপরাপর হইয়া উঠে—আর এই নিতান্তই বস্তুগুলোর সঙ্গে তার সম্পর্ক কিছুতেই ভুলিয়া থাক। যায় না বলিয়া আকুঁল কদনে অভিষিক্ত হইয়া উঠে।

কিন্তু এই দ্বেই এই বেদনা এই কদন ও অমূলোভিতর অন্তর কোথায়? সম্ভবহ শ্যুমার যে দায়ি জীবন পড়িয়া আছে, যে জীবনের
ছুর্ণমের সক্ষিপ্ত

সারাপথটা যদি এই অঙ্করাশির ভিতর দিয়াই অতিরিক্ত করিতে হয়, তাহা হইলেই বা এই বেদনার পরিসমাপ্তি হইবে কোথায়? এই মর-জীবনের বেদনারাশি দিবসের অন্তু জীবনের পথপ্রাপ্তে যেখানে সন্ধ্যা আসিয়া দেখা দিবে, যেখানে হইতে পা বাড়াইলে আর আলোকের মুখ দেখা হাইবে না—যেখানকার জীবনকে জীবন বলিয়া নরলোকের মর-জীবন বলা আর চলিবে না, যেখানে সারা জীবনের এই দৃঢ় বেদনা ভাবনার জমাট বাধা গুঁড়াভারকে পশচাতে ফেলিয়া রাখিয়া যাওয়া চলিবে? না কি এই বেদনার ছালা পৃথি বহিয়া জীবনের পরপারে দাড়াইয়া বেদনার বেসাতী করিতে হইবে? তাহাই ভাবিতে তাহাই ভাবিতে সহসা একদিন অক্ষরের অক্ষরের প্রথম উঠিল যে, তাহার এই বাথা ও বেদনার শেষ যেখানেই হউক মূল কোথায়? অন্ত সব নাবীর মতই স্থায়। কেন শাশ্তিতে জীবন কালাইতে পারিলাম, কেন স্নায়ুবিশেষ অপমান করিয়া এভাবে নিজেকেও সংসারকে রিক্ত করিয়া দিল? সংসারে তাহার পরম সেহসৃষ্টি পিতা ছিল, পরম শ্রেষ্ঠত্ব স্নায়ু ছিল, তাহার বিরাট বিশাল সংসারে দাস দাসী আত্মীয় স্বজনে গৃহ পূর্ণ হইয়া আছে। একদিন ত ছিল এই গৃহের অর্ধম ও হাস্ত কোলাহলকে গৃহের পরিত্ব স্থানে আবদ্ধ রাখা যাইত না। পুরুষনাদের হাতেহাতি বাহিরের পথ ঘাট ও উত্তানকেও পরিপূর্ণ করিয়া দিত। তাহার এই পরিপূর্ণ স্থানের মাঝে এই যে অপূর্ণত। শুধু

৫৬
দুর্গমের সঙ্গীনী

তাহাকেই বিক্ষুট করিয়া রাখিল, ইহার প্ৰকৃত কারণ কোনখানে ?
হে ভগবান্‌ এর জন্য অপরাধী কে?

স্থৃমার চিন্তা যখন খুব নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল—সেই সময়েই সম্ভূক্ত হৃদয় আরো খানায় তাহার প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াই স্থৃমা সহসা চমকিয়া উঠিল। যেন তাহার সমস্ত প্রেমের উত্তর একবারে মূর্তি ধরিয়া। সম্ভূক্ত উপভোগ হইল—দরণে যে সুন্দরীর প্রতি স্থৃমার দৃষ্টি চুলিয়াছিল, এ সুন্দরী, যে তাহার প্রেমের অপমান করিয়াছে ও তাহার গৃহে অশান্তি ভাঙিয়া আনিয়াছে। স্থৃমার ভিতরের এই রূপের গর্ব এবং তাহার পশ্চাতে তাহার পিতার অগাধ সম্পত্তি তাহার গর্বিত হৃদয়কে অধিকতর গর্বিত করিয়াছে, তাহা বুঝিতে স্থৃমার বাকী রহিল না। স্থৃমার সেদিন মনে করিতেও লজ্জিত হইতেছিল যে যৌবনের রূপবাসী যেদিন তাহার ললিত অঙ্গে পলায়িত হইয়া উঠিয়ার উপকূল করিয়েছিল, সেদিন সত্য বটে সে এই দৃষ্টি সম্ভূক্ত দৃঢ়ত্বই তাহার অনান্ত বক্ষের প্রতি হইয়া কুন্দন্তে অধর দণ্ডন করিয়া কলন। করিয়াছিল যে, নিশ্চয়ই কোন রাজা আসিয়া তাহাকে রাগী করিয়া লইয়া যাইবে। শুধু কলনাই নহে, ইহা যে সত্য হইবে, এই রূপসী যে রাজার চেলের হাত ছাড়া হইবে না—শৈশব হইতেই আত্মীয় ও অনামীরগণ বহুবার তাহাকে এ প্রতিশুদ্ধি দিয়াছিলেন।

৫৭
দুর্গমের সঙ্কিনী

আর কৈশোর অতিরিক্ত করিয়া। দৌবনের সঞ্চিত তরলীর উপর
pদার্পণ করিতে যাইবার ঠিক পূর্ব মুহুর্তে যখন নর ও নারীমাত্রেরই
স্থখ কর্তা। অত্যন্ত নিবৃত্ত অত্যন্ত রাঙ্গন হইয়া উঠে, তখন স্থখমা
সেই সব আস্থাবাহী অত্যন্ত আশার সহিত আলিঙ্গন করিয়া
ছিল৷

কিন্তু সেই অনাগত রাজপুত্রের পরিবর্তে সেদিন দীন দরিদ্র
বীরেশ্বর আলিয়া, তদিনি একপক্ষে যেমন ভয় ও সতর্কের অবধি
ছিল না । অপর পক্ষে তদেরই যুগান্ত ও বিবেচনা অত্যন্ত ছিল না । তাই
বীরেশ্বরই যখন কর্ত্ত অনাগত রাজপুত্রের স্থখ অধিকার করিল,
তখন ক্রোধে ও জ্বালায় স্থখমার সব অঙ্গ জ্বলিয়া গিয়াছিল৷

কিন্তু সেদিন অলিয়া ছিল বলিয়া যে বলিয়া বরাবরই অশ্লীল
করিতে লাগিল এবং পরিশেষে এক ভূতের চেয়েও হীন তাঁহাকে
তাহাকে অপমান করিল, যে এই রূপ আর তাহার এই রূপাশির
পাশে তাহার পিতার রূপার রাশি । তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র রহিল
না । তাই আজ এত্তদিন পরে প্রায় সব স্থখ হইতেও সব স্নেহ হইতে
বঞ্চিত হইয়া দেহ ও মুনে যখন সম্বন্ধ দিলা ধরিয়া রাখ যাইতেছিল না,
তখনই সর্বাঙ্গে তাহাদের সংহার করিবার কথা মনে জাগিয়া উঠিল ;
আর হয়ত এই নব কল্পনার কিছুদিন কার্য্যে পরিণত করিতেও সে ক্লান্ত
করিত না, কিন্তু ঠিক এই সময়ে বসন্ত সেহানে আলিয়া। তাহার নিঃর্জন

৫৮
ডুর্গমের সনিনী

কলনাতে বাখা দিল এবং কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই বলিল—মা, আমাকে একবার চুটি দাও—আমার মাসীর বড়ই ব্যামো সে আমাকে একবার দেখতে চেয়েছে ।

স্থখ্যা তাহার দিকে একবার ফিরিয়া চাহিল এবং তাহার দৃষ্টি হইতে উঠিয়ণা বা অনুশোচনার কোন চিহ্নই ধরা গেল না বটে, তবু কতকটা সমবেদনার বরেই সে বলিল “ভাই বসন্ত, তা তোমার মাসী আছে বলেই ত কোন দিন জনিনি ?

বসন্ত কিছু একটা জবাব দিতে যাইতেছিল—কিন্তু সে কথা কহিবার আগেই স্থখ্যা পুনরায় বলিল তা’ এ সময় যাওয়া উচিত বইকি ? কিন্তু কবে আসতে পারবি—তা’ ব’লে যা বসন্ত—তোমকে না হ’লে আমার চল্বে না—সেটা। ত’ তোর জানতে বাকী নেই বাপু ?”

“কিন্তু কি কর’ব মা”—বলিয়া বসন্ত আরও কিছু একটা বলিতে যাইতেছিল । কিন্তু স্থখ্যা তাহাকে একটা বঝার দিয়া বলিয়া উঠিল “মা মা করিসে বাপু—মা হ’তে আমার দাও পড়েছে—এই চাবী নিয়ে ছোট বক্সটা থেকে দশটা টাকা বের ক’রে নিয়ে যা, দশ দিনের বেশী ছুটি পাবি না। তা’ ব’লুঝি বলিয়া চাবীর গোছাটা কেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিতে বলিতে গেল—তোমার আর ছুটি নেবার সময় হ’ল না। আমারও মরণ নেই, তোমাদের হাত নেই।
ছুর্গের সঙ্কিনী

থেকে—এই পর্যন্ত বলিয়াই সে অবৃত্ত হইয়া গেল। বসন্ত আর কিছু শুনিতে পাইল না। কিন্তু যাহা শুনিয়াছিল, তাহার জন্ত তাহাকে কিছুমাত্র দৃঢ়ত্ব বা চিন্তিত বলিয়া বোধ হইল না।

(১৭)

দাসী হইলেও বসন্ত চিরদিন শুধু দাসীই ছিল না—তত্ত্ব গৃহহৰের সে একদিন এক অনিপূণ গৃহিণীই ছিল—আর দারিদ্র্য তাহার যতখানিই থাকৃ সে গৃহের শত অভাব অভিযোগের মাঝেও তাহার নিপুণতা তাহার দুর্দৃশ্ব গৃহহৰলীকে শ্রীসম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু বিধাতা তাহাকে সংসার করিতে দিলেন না—এককালে তাহার স্বামীকে ও একমাত্র পুত্রকে টানিয়া লইয়া সংসারকেই শুধুত্রশান করিলেন না—এই নারীর সংসার করলাকেও বিষয়টি করিয়া দিলেন। তাই পরিণত ঘোষনায় তাহাকে দাসীরূপে করিতে বাহির হইতে হইয়াছিল—শুধু গ্রামসাধারণের জন্যই নহে—এককালকার প্রতিষ্ঠিত গৃহের নির্জনতাই ও রক্ষণহীনতা। এই নারীকে গৃহে তিনিতে দেয় নাই বলিয়া। কিন্তু দাসীরূপে করিতে আদিয়াছিল বলিয়া সে সাধারণ দাসীর ম্যাতই ছিল না, তাই প্রতির মঙ্গলের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চেষ্ট করিয়া দিতে তাহার কোথাও বাধিত না।

৬০
দুর্গমের সঙ্গীনী

এলাহাবাদের সেই নির্জ্জন কুঠারে অত্যন্ত নির্জ্জন অবস্থায় সে যখন স্থবিমান হায়ান’ স্থানীয় সম্প্রদায় পাইয়াছিল—তখন প্রভুকে ফিরাইয়া পাইবার অভ্যাস। অতৃপ্ত মুনিয়ার গতি বিধি সে এমনই সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়াছিল—আর তাহার ইতিহাস এমনই তন্ত্র তন্ত্র করিয়া অন্তরস্রাবন করিয়া জানিয়া লইয়াছিল, যে কোনু দিক হইতে কোনখানে আবার করিলে তাহার নিজের উদ্দেশ্য সফল হইবে—তাহ। এই অতিসতর্ক রমণীর বুঝিতে অধিক বিলম্ব হয় নাই।

তাই শ্রীমানকে গৃহে ফিরাইয়া আনিয়া অধিশ সে স্মৃতি খুঁজিতে ছিল, আর তাহার কল্লোকে কোনের পরিণত করিবার জন্য তাহাকে নানা রূপ দিয়া ফলের আকার অন্তর্মান করিতেছিল—আর যদিন তাহার এই সংস্করণ একটা কল্লিত মৌলিক আসিয়া পৌছিল—সেই দিনই সে ছূটিয়া আত্মজন করিল—আর এমনই ভাবে তাহ। পেশ করিল যে, তাহাকে বার্থা করিয়া দিবার সামর্থ্য কাহারও বাহিল ন।

কল্লু ছলিয়া গেল ; ছূট তাহার বিনের জন্য প্রয়োজন—তাহ। কেহই বলিতে পারে না। কারণ কল্লের কোন মাসী ছিল কিনা— থাকিলেও তাহার সত্যী পীঠা হইয়াছিল কিনা—আর হইলেও তাহ। সাংঘাতিক কি না, এবং কল্লের সেজন্য মাত্রাবাদ্ধ ছিল কিনা, তাহ। একমাত্র সেই জানে—আর বোধ হয জানেন ভ্রমণ। কারণ ।

৬১
দুর্গমের সন্ধিনি

এই বসন্তের কার্যগুলার পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠিত উপরের সেই সরকার অর নৌচাল বসন্ত নিজে ভিত্ত আর কেহই জানিত না। সে কখনও কাহারও অনিষ্ট করে নাই—বরং পরের ইষ্টের জন্য তাহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে দেখা গিয়াছে। আর স্থবির জন্য তাহার গুরুতাকাঙ্কার সত্যই অস্ত ছিল না, আর সে কথা জানিতে তাহাদের পরিচিত কাহারও বাকী ছিল না। তাই বসন্তের প্রয়োগন যাহাই থাকুক—তাহাকে নিষেধ করিতে কেহই চাহিল না।

বসন্ত কিছুত তাহার যে পথে বাড়া—সে পথের ধার দিয়াও গেল না—বরং ঠিক তাহার উল্টা পথে রাণীগড়ের এক খনির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল—কিন্তু কেন করিল তাহা সেই জানে। সেখানে তাহার আর যে কেহই থাকুক—মানী যে ছিল না, সে বিষয়ে বোধ করি অসংখ্য মত প্রকাশ করা যায়।

পরদিন প্রভাতের আলো। ধর্ষরীন্ত আঁকে পুলক স্পর্শ দিয়াছে, ফুলকূল তাহাদের ওষুধবে হাসির রাশি লইয়া। ধর্ষরীষ আকুল করিতে স্নুক করিয়াছে—খনির কার্যা বথারাতি আরস্ত হইয়া গেছে—এখনই সময়ে বসন্ত আরাম খনির দ্বারের পাঠাইল—আর প্রথমেই যে কুলীটাকে দেখিতে পাইল, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিল যে নলু নামে যে কুলী এখানে কাজ করে সে কোথায়?

কুলীটা সত্যিই বিশ্বিত হইয়াছিল—ভদ্র বংশীয় বাঙালী কোন

৬২
দুর্গমের সঙ্গীনী

স্মৃতিকে একাকী এভাবে এখানে আসিতে পারে তাহ। এতকাল পর্যন্ত সে কোন দিন দেখে নাই। বোধ করি, এই সত্তাটা তাহার কল্পনার অ নীত ছিল, তাই সে অতিমাত্র বিশ্বাসে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু ঠিক এই সময়ে আর একটী কুলী রমণী সেই পথ অতিক্রম করিতেছিল, বসমত তাহারের এই একই কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে উত্তর করিল যে, নল্লু নামে কুলী এখানে একজন নাই অনেক আছে, কোনু নল্লুকে বসমত চাহে—তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা দরকার—নাহিলে এই কথার খনিতে কোন নল্লুকেই সে খুজিয়া পাইবে না।

কিন্তু বসমত যখন বলিল যে, মুনিয়া নামে যাহার শ্রী পলাইয়া গিয়াছে—আর্ম সেই নল্লুকেই চাই—তখন সেই কুলীরমণীটি ঈশ্বর বাণ্ড করিয়া। পার্শ্বপর্য্যন্ত কুলীটাকেই দেখায়া দিয়া চালিয়া গেল—বাড়ীবার কালে সে বারবার স্বৰ্য্যাঞ্চল দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে নাগিল; নল্লু ও মুনিয়ার জন্য এই রমণীর এত মাথা বাৰ্ধ। কেন—তাহা জানিবার জন্য তাহার কৌতুহলের অবধি ছিল না।

৬৩
( ১৮ )

এই মূনিয়ার জীবনের কুদ্র একটা ইতিহাস ছিল। সে কোন দিন নলুকে বিবাহ করিয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই—কিন্তু নলুর সঙ্গে তাহার গ্রহণ অনেক বিবাহিতা স্ত্রীর চেয়েও কেবল ছিল—সে কথা ও অঞ্চলের কুলি মহলে কাহারও অজানিত ছিল না। এই মূনিয়া দেদিন যৌবনে প্রথম পদার্পণ করিতে যাইতেছিল—ঠিক সেই সময়েই একদিন নলুর সঙ্গে তাহার দেখা। তারকা-খচিত নীল আকাশ তলে নয়—নদীতীরে, কুঞ্জবনে, এমন কি একটা ছায়া শীতল পট বা অস্থ্য বৃক্ষের তলেও নয়; হাসির ভিতর দিয়া, সঙ্গীতের ভিতর দিয়া, চাহিনি ও ভঙ্গিমার ভিতর দিয়া এই ছই নরনারীর প্রাণের বিনোদন হয় নাই—হইয়াছিল প্রথম রৌদ্রে একটা তন্ত্র খাটিয়ার উপর শুইয়া করণ আর্তনাদের মধ্য দিয়া। তাহারই কিছুদিন আগে নল খানির কাজ করিতে গিয়া অত্যন্ত আহত হয় এবং খনিতে মধ্যে অন্ধন হইয়া তাহার শরীরের কিয়দংশ পুষ্পিত যায়। তাহার সঙ্গীরা অপর তাহার গুরুষ। করিত না। এমন নয়—কিন্তু তাহারও পরের চাকর—নতুরং কাজের সময় তাহারা রোগীর পরিচয়। করিতে পারিত না।
দুর্গমের সঙ্গীনী

এমনই তাদের একদিন সঙ্গীনী যখন কাঁথে চলিয়া গেলে, আর শব্দাগত অবস্থায় নরু বেঁচানি ঘটিয়াছিল সেখানে প্রথম রৌদ্র আলিয়া পড়িয়াছে—আর বেঁচারী নরু রোগের আলায় ও রোগের আলায় করল আর্তনাদ করিয়াছে—এমনই সময়ে মুনিয়া কয়েকটি সদৃশ লইয়া সেখান দিয়া যাইতেছিল, নরু কে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া। সেখানের কেহ উপহাস করিয়াছিল—কেহ কটুকি করিয়াছিল কেহ বা দৃঢ় প্রকাশ পর্যন্ত করিয়াছিল—করিয়া চলিয়া গিয়াছিল; কিন্তু এই সময় নসুর্খকে সেবা করিতে অংশ নাহি। কিন্তু মুনিয়ার ভিতরে একটা সত্যিয়ার নারীর প্রাণ ছিল—সে তাহাকে তাহ করিয়া যায় নাই। রৌদ্রীর হাতে যাহার হাতে লইয়া আর আর্তকে গুণ্ড করিয়াছিল। আর তাহারই সেবার আশ্বাসে নরু যেনিন ক্ষুদ্র হইয়া উঠিল—সেদিন আর মুনিয়াকে ছাড়িয়া দেয় নাই—নিজেরই করিয়া লইয়াছিল—আর মুনিয়াও তাহার আপত্তি করে নাই।

কিন্তু একত্রে থর করিতে গেলে—সেখানে শুধু নিছক ভালবাসারই প্রত্যাশা করা যায় না; একই আকাশের বক্ষে পুরীষা ও অমাব্দার আবির্ভাব হইয়া থাকে। তাহ তোমার পাঁচবৎসর থর করিয়াও পুরীষার স্থানে যায়। মাঝে মাঝে অমাব্দা দেখা দিতে লাগিল—আর সমাজে একটা ঘটনা হইতে তাহাদের বিচ্ছেদ একবারে সম্পূর্ণ হইয়া গেল।
দুর্গমের সঙ্গীনী

( ১৯ )

সেই এমনকি এক শুভ্রুক ব্যাপার লইয়া। এমনকি এক অসভায়ক দিনের পর দিন দেবো করিতে দেখিয়া নল্লু অত্যন্ত কুলক হইয়া মনিন্দাকে একদিন অত্যন্ত পুরো করে—আর তাহ হইতেই ঘোট হও ঘটিয়া যায়, তাহারই উত্তেজনার ফলে মুনিয়া নল্লুকে চার্ডিয়া চার্লিয়া যায়। কিন্তু পথে বাড়ির হইয়া পথরামে এবং সময়ের ব্যবধানে উত্তেজনা যখন অবসান পরিণত হইল, আর মন যেদিন নির্ভরের উদাস হইয়া গেল—সেই দিনই সকালের নদীতীরে মাথায়ে মৃত্যুপ্রায় বাঁচন্দ্র রায়ের সঙ্গে মুনিয়ার দেখা হইল।

তারপর দুটি আহত মনই যেদিন আহত দেহ লইয়া। পরম্পরের সঙ্গে সংলাপিত হইল—সেদিন তাহারা কোথায় গিয়া মিশিয়ে—কতুরা যাইয়া তাহাদের বিপ্রীতি অবসান হইবে—তাহা মন লইয়া যেমনই কিছুদিন তোলপাড় করিয়াছেন—অন্ধমান করা তাহারই সত্ত্ব। যার হজনই খাইয়াছিল—স্তরাং যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা উভয়েরই মনে মনে হইয়া গেছে—কিন্তু শক্তি কুলায় নাই বলিয়াই মনের ক্ষত্রীয় এতিন চাপা পড়িয়াই ছিল—কিন্তু হট বিদ্রোহী মন যেদিন এক সঙ্গে মিশিয়ে—সেদিন মনের ধর্ষ সাধিতে

৬৬
মন ছাড়িল না; কখন যে তাহারের উভয়েরই অজ্ঞাতসারে একাইকে অজ্ঞাতসারে করিল—তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না।

তাহারা বুঝিতে পারিল না সত্য, এবং বুঝিতে পারিলেও তাহাদের হয়ত ফিরিয়া পথ ছিল না—একথাও মিথ্যা। নহে—এবং তাহাদের মিলনে অন্য কাহারও ক্ষুর হানি না হইলে হয়ত তাহাদের মিলন চিরদিন না হউক—আরও কিছুদিন অটুট থাকিয়া যাইত, একথা মনে করাও অসম্ভব নয়। কিন্তু ক্ষজ্ঞান ও বস্তুর তাহাতে সত্য হইতেছিল—তাহাই তাহারও বাহির হইয়াছিল—তাহাদের ক্ষতিরূপ করিয়া গইতে, আর বৌদ্ধগুহকে তাহাদের আয়ত্তের মধ্যে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। তাই বসস্ত আসিয়া নল্লুকে করিল—আর তাহার স্নাতক ফিরাইয়া আনিবার জন্য উত্তেজিত করিতেও জন্য করিল না। কিন্তু নল্লু যখন বালিল যে, তাহাদের সদরদের অনুমতি না পাইলে সে যাইতে পারিবে না—এবং যাইলে তাহার চাকুরী যাইবে—তখন অগত্যা বসস্তকে তাহাদের সদরদের কাছ পৌঁছান্ত যাইতে হইল। কারণ সে যে কাজ করিতে বাহির হইয়াছিল—তাহাই অমুষ্মান রাখিয়া যাইলে এত পরিশ্রম সবই বাহির হইয়া যাইবে। ক্ষুদ্রদের জীবন বাহির হইবে—তাহার একাইকের চেষ্টা সফল হইবে না। কিন্তু কে এই সদরদের এবং বসস্ত তাহার কার্যের কিছু কৈফিত্ত দিবে—তাহারই একটা খসড়া। মনে মনে

৬৭
চুর্গেগের সঙ্কলন

করিয়া। নইলে যখন সর্দারের সমুখে উপস্থিত হইল, তখন আত্মাঞ্জ বিশ্বাসে দেখিতে পাইল যে, এই সর্দার তাহাদেরই অতি পরিচিত তিনকড়ি।

কিন্তু এই পরিচিতের যে পরিচয় সেও তাহার প্রত্যেকে স্মরণ। পাইয়াছে তাহার সম্পদে মেয়ে কিছুই বলিবার নাই, আজ এই দূর দেশে এই পরিচিতের পরিচয় বন্ধনের মধ্যে পড়িয়া। পরিচয় করিবার মত ইচ্ছা তাহার ছিল না। এমন কি ইহার মধ্যে মহব্বত ও প্রত্যেক তাহার বয়সিনী থাকে—তিনকড়ি যে ইহার কদম্বন করিয়া এবং এই ঘটনা হইতে কতবার লজ্জাকর গল্প রচনা করিয়া—তাহার বুঝিতে তাহার বাক্য ছিল না। কিন্তু ভবিষ্যতে যাহা হইবার তাহাত’ হইবেই, কিন্তু সমুদ্র যে বিপদ উপস্থিত হইল—তাহাকে অতিক্রম কারিতে যে একটু বেগ পাইতে হইবে—এমন কি একটু কৌশল করিতে হইবে, অনিচ্ছা থাকিলেও বাধ্য হইয়া। বসন্তকে এই কার্য করিতে হইবে, তাহাও তখনই সে ত্রী করিয়া লইল। তাই সমুদ্রে তাহাকে দেখিয়া তিনকড়ি যখন অতিমাত্র বিশ্বাস জিজ্ঞাসা করিল “কি রসময় যে এখানে ?”

বসন্ত প্রায় গভীর হইয়াই উত্তর দিল “হঁ। তিনকড়ি বাবু আপনা এই কুলীটিকে ছুই চার দিনের জন্য একবার ছেড়ে দিতে, হবে—আমার একটু কাজ করবে।”
চুর্গমের নাডিনী

তিনকড়ি আরও বিশিষ্ট হইয়া প্রথম করিল “কে ? এই কুলী ?
এ তোমার কি কাজ করে বসন্ত ?
“গরীবের কাজ তিনকড়িবাবু, নয়। করে একে ছুটি দেবেন কি ?”
কি কাজ না জানলে ছুটির কথা কি করে বলি বসন্ত। আমি
যে বুঝিতে পার্চি না—বলিয়া বোধ হয় সে আরও কিছু বলিতে
মাইতেছিল। বসন্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া করিল থে ওর লীলা মুনিয়া
এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে এলাহাবাদে আছে, তার সঙ্গে আমার
দেখ। হংসের থেকে তাই একে খবর দিয়ে এসেছি ; কিন্তু ও মূর্তী
আপনার অনুমতি ভিন্ন গুরু যুবতী স্তোত্রকে আনতে যেতে চায় না।
এই পর্যন্ত বলিয়া বসন্ত একটু হাচিল—নন্দুর ছুই যে যুবতী এই
কথাটা তিনকড়িকে শুনাইয়া দেওয়া তাহার প্রয়োজন ছিল।
কিন্তু তিনকড়ি তাহাতে ভুলিল না। প্রথম করিয়া বসিল,
তোমাদের জমিদারী কেমন আছে বসন্ত ? ওকি ? তুমি ধাড়িয়ে
যোগে কেন ভাই—এইখানে এসে বস না—এই নাও আমি সরে
যাচ্ছি—বলিয়া সে একটু নড়িবার চেষ্টা করিল।
বসন্ত নড়িবার চেষ্টা ও করিল না—যেইখানে ধাড়িয়াই বিচ্ছাস।
করিল “আপনি কতদিন এখানে এসেছেন ?”
তোমার ত আর আমাকে অন্ন দিলে না বসন্ত—কি করি ছুঁপয়সা।
রোজগার করে হবে ত ?

৬৯
ছঙ্গমের সঙ্গীনী

বসন্ত ঘাড় নাড়িয়া বলিল “তা বেশ করেছেন, আমরা চাকরীর বাক্স মাঝে—আমাদের কি হৃত তিনকাঠিবাবু ?”

তোমার খুব হাত বসন্ত আমি তোমাকে ‘পাচশ’ টাকা দেব। তুমি যদি আমায় একটু দয়া কর—বলিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল স্থয়ন ত তোমার কথায় ছেড়ে যেতে পারা—বলিয়া কিসের একটা ইঙ্গিত করিয়া হাসিয়া করিল।

এই ইঙ্গিতে বসন্ত হাড়ে হাড়ে জলিয়া গেলেও এইবার যে একটা কৌশল করিতে হইবে—তাহা বুঝিতে ভুল করিল না। তাই নিজেও সে অধরে মৃদুহাস্ত তুলিয়া মৃদু কঠে বলিল “এখন আর আমায় টাকা দিতে হবে না—বলিতে বলিতে বোধ হয় লজ্জাতেই তাহার মাথাটাই হেঁটে হইয়া গেল—সেই অবস্থাতেই কি একটা ভাবিয়া লইয়া সে আবার বলিল “কিন্তু কার যে কত দরদ্ব তা’ আর বুঝিতে কারও বাকী নেই তিনকাঠিবাবু।”

তিনকাঠি একবারে উৎফুল্ল হইয়া বলিল। উঠিল “তাহলে তুমি এই জয়ই এসেছ বসন্ত, তোমাকে আমার অদেয় কিছু নাই—কি চাও বল ?

বসন্ত হাসিয়া বলিল—কিছু চাই না বাবু—এই কুলিটাকে হৃদয়ের জল ছড়ে দিন—

তিনকাঠি সোঁসাগাই বলিল। উঠিল “হৃদয় কেন বসন্ত, আমি
টাকে দশদিনের জন্য ছেড়ে দিচ্ছি, তুমি কিছু আমার উপায় কর।

বসন্ত হাসিয়া উত্তর করিল আপনার উপায় আমি কি করব তিনকড়ি বাবু, বড়লোকের ব্যাপারে গরীব মানুষকে টানবেন না আপনি নিজেই চেষ্টা করুন না।

তুমি ভরসা দিচ্ছ তা? তুমি ভরসা দিচ্ছ? বসন্ত বলিয়া তিনকড়ি আসন ছাড়িয়া আসিয়া তাহার সন্ধ্যে গাড়াইল।

বসন্তর ইচ্ছা হইতেছিল যে পদাঘাত করিয়া এই লম্বটকে তাহার সন্ধ্যে হইতে দূর করিয়া। দেখ, কিন্তু তাহাতে তাহার সাথের মনের ক্ষতি হইবে বলিয়াই সে একেবারে হাত জোড় করিয়া। অত্যন্ত বিনীত ভাবে উত্তর দিল, আমাকে বলবেন না বাবু আপনাকে একটা চেষ্টা কর্‌তে হবে, বড়লোকের কথা।—এই পর্যন্ত বলিয়াই সে কঠিনতার আমূল পরিবর্তন করিয়া। যেন অতি ব扬州 ভাবে বলিল "কিন্তু আমার নাম যেন সন্ধ্যে আন্বেন না বাবু, আমি অতি গরীব লোক দেখবেন আমি যেন মজ্জ ন।

বাহিরে আসিয়া বসন্ত মনে মনে বলিল “ভগবান, আমি আজ যাহা করিলাম মানুষের চক্ষে তাহা। অত্যন্ত হীন কৃত্তিয়া, কিন্তু তুমি দেখিয়ে প্রভু যে, ব্যবধানে ঘর হইতে বাহির করিতে না পারিলে তাহার স্নাত্মার সঙ্গে মিলন হইবে না। আমার সঙ্গদেশের
ধূর্গমের সঙ্ঘিনী

মধ্যে যদি কোথাও কিছু ভুল করিয়া। বাঁচি, হে প্রেমু, হে দয়াময়, তুমি তার জন্য আমায় মার্জনা করিও।

( ২০ )

দয়াময় প্রেমু বসন্তকে মার্জনা করিবেন, তাহার বোধ হয় অসংশয়ে বিশাল করা যায়; কারণ পরিহিতে অত্যাচার করিলেও বিচারকের চক্ষে তাহার দোষ বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু যাহার জন্য বসন্ত এই সমুহ কষ্ট বিকার করিয়াছে, তাহারকে সহজে নিষ্কৃতি দিবেন বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। কারণ বিবেকের দংশন যদি ঐশ্বর্যের দেওয়া শাস্তি বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে এই নারীর শাস্তি বহনিন্ত আরম্ভ হইয়া গেছে। কারণ না থাকিলে কার্য হওয়া সম্ভব নয় ইহার সত্য বটে, কিন্তু কার্য্যও দুঃখ হউক কি বংচিত হউক তাহার একটা ফল প্রসব করে ইহাও মিথ্যা নয়। স্মরণকৃত দূর করিয়া দিয়া কোন নারী সম্পূর্ণরূপে ভুল হয় কিনা জানা নাই, কিন্তু স্মরণ ভুল হইতে পারে নাই তাহা এই রমণীর এলাহাবাদ যাওয়া উপলক্ষে ধরা পড়িয়া গেছে। কিন্তু তব তাহার গুছনু বেদনা রাশি বসন্তর গ্রামের গ্রামে দিয়া ঢাকা ছুল বলিয়া এতদিন সহ করিবার সীমা অতিক্রম করে নাই। কিন্তু বসন্ত থেকে চলিয়া ।

৭২
দুর্গমের সখিনী

gেল এবং প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে কি ফিরিয়া আসিল না, তখন নীরবে নির্জনে স্বৰ্পমার শূন্য প্রাণ যে চিন্তার অবসর পাইল তাহাতেই তাহার চঞ্চল ও বেদন। অত্যন্ত বড় হইয়া আঘাতপ্রকাশ করিল। এমন কি যে মুনিয়াকে স্থানীয় সখিনী দেখিয়া সে ক্রোধভরে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল তাহাকেই বীরেশ্বরের সত্যকার প্রণয়িণী বলিয়া মনে করিতেও কুষ্ঠিত হইল না।

নারী নাকি সব সহিত পারে শুধু স্থানীয় অন্তটি হাতে সখিনী দিতে পারে না। ইহা সত্য কিনা জানি না, কিন্তু যদি সত্য হয় তাহা হইলে স্বৰ্পম। এই জাতির নারী হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু তবু এই নারীর ভিতর নারীসৃষ্টি যে একেবারে মরিয়া যায় নাই—তাহাই প্রকাশ হইয়া পড়িল। তাহার আর একদিনের আচরণে।

সে একদিনকার মনোরম স্বর্যাভ্যন্তরে, মেঘান্তরিত স্বর্যের অক্ষপ্রকাশ আলোকে ধরিত্রীর বক্ষ তখনও শ্যামলে ও শ্যামলস্বর্ণ বলিয়া মনে হইতেছিল, শীতল বাতাস শরীরে যে শিরশ জাগাইতেছিল তাহাতে স্বর্যাভ্যন্তরের অন্তর্বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিবিড় মেঘের বর্ষণ হইতে করিতেছিল না।—প্রায়তনদের বিচ্ছেদ বেদনা ও বাতাসের হর্ষে স্পর্শ দেহের ভিতর দিয়া মরমে গিয়া নিবিড় হইয়া উঠিতে ছিল। আর পুস্পের শুভ্রাত অতীতদের কাহিনীগুলি। কন্ধেরের গুরুত্ব-চরের মত মনের মাঝে বর্ষমান করিয়া দিতেছিল। আর তাহাদের ৭৩
দুর্গমের সন্ধ্যনী

মাঝখানে স্থিত বসিয়াছিল তাহার ছাদের একাঙ্কে, একাড় একাখী, তাহার অষ্টাড় নির্দৃষ্ট প্রাঙ্গণে কতখানি মেঘ করিয়াছিল বলা যায় না, কিন্তু বাতাস যে তাহার অঞ্চল প্রাঙ্গণ লইয়া অত্যন্ত স্পর্শ্ব প্রকাশ করিতেছিল—সেদিকে তাহার দৃষ্টি দিবারও অকাশ ছিল না।

এমনই সময়ে পাড়ার একটি মেঝে কালী আসিয়া। ছাদের উপর বসিল, আর স্থিতকে হই একটি সামান্ত শীষ করিয়াই অঞ্চল হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া। তাহার হাতে দিল, দিয়াই সলজসভাবে বলিল স্থষ্মাদিদি, আমার একখানি চিঠি লিখে দিতে হবে।

স্থষ্মা একটু হাসিয়া। বলিল, তাহলে নৈচে চল এখানে ত দোয়াত কলম নেই।

কালী বলিল আমি দোয়াত কলম তোমার ঘর থেকে এনে দিচ্ছি, এইখানেই বস। নৈচে আমার সজ্জা করো। বলিয়াই উঠিয়া গেল। তাহার কোলের ছেলেটা স্থষ্মার কাছেই বসিয়া রহিল। স্থষ্মা এই ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার গায়ে হাত বলিয়া দিতে দিতে হইতে হইতে বাড়ি দিদি। কিন্তু পরক্ষণেই চক্ষু মুহূর্ত। কিন্তু মুহূর্ত হইয়া বসিল পাছে, তাহার এই অকারণে অক্ষরবিন্দু গুলা কালীর চোখে পড়িয়া যায়।

এই কালীর সঙ্গে স্থষ্মার আলাপ ছিল শৈশব হইতে। এক পাড়াতেই তাহাদের বাড়ী স্থতরাং তাহাকে শৈশব সন্ধ্যী বলিলেও

১৪
ছুর্গমের সঙ্গীনী

অতুল্কিত হয় না। কিন্তু স্বধমার অল কয়েকটি সঙ্গীনীর মধ্যে অবস্থার পার্থক্যে দেখা শোনা যে একটা কাহারও সাহস হইত না। কারণ তাহাদের প্রত্যেকেই স্বামীর গৃহে চলিয়া গিয়াছে; অর কয়েকদিনের জন্য তাহারা যখন আসিত তখন জমীদার বাড়ীর দেউড়ি পার হইয়া অন্ধপুরে প্রবেশ করিয়া কাহারও সাহস হইত না। স্থতরাং দেখা যায় বড় একটা হইত না।

কিন্তু বসতি চলিয়া যাইলে স্বধমা প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে দেবমন্দিরে যাইতে আসিত করিয়াছিল, সেই সময়েই একদিন সন্ধ্যাকালে গোবিন্দের মন্দির প্রাঙ্গণে পূর্ণতান সত্যি কালীর সঙ্গে সংঘাত হয়। সেই দিন হইতে কতকটা স্বধমার আগেই কালীর প্রায় প্রত্যহই আসিত—আর মেয়েরগণই প্রায়ই স্বামীর কথা হইত। এই মেয়েটালে কোন ক্রমেই স্বামী-প্রেম উত্থাপন না করিয়া দেখিতে পারিত না—মাঝে মাঝে স্বামীর কথা কহিতে কহিতে সে এমনই তমায় হইয়া যাইত যে, স্বধমার কৃত যে ক্ষত্বার সজল হইয়া উঠিত আর কতবার সে গোপনে চক্ষু মূর্ছিত—তাহা লক্ষ্যই করিত না।

কিন্তু স্বধমার কোন দিন কালীকে তাহার অতিরিক্ত গর্ল বলার স্বখ হইতে বাহিত করে নাই—কুথিতের মতো অপরর গোরের কথা-গুলা সে কান দিয়া অত্রচুর করিত, তাহাতে স্বধা মিটিত না বটে—এমন কি ছুর্গম দূরে আকাঙ্ক্ষাই জানিত—কিন্তু যে বন্ধ সে উপেক্ষা

৭৫
হুগমের সঙ্গীনী

করিয়া হেলায় হাঁঝাইয়াছে—তাহার অন্তে কি করিয়া কত বছর করিয়া উপভোগ করে—তাহার দেখিবার ‘ও শুনিবার লোভ সামলাইতে কিছুতেই পারিত না।

এইরূপে বসন্ত থাকিতে যে ক্ষেত্রে পাওয়াই প্রলেপ পড়িত—তাহাই বসন্তর অমৃপত্তিক কালে নিত্য বাড়িয়া যাইতে লাগিল—আর স্থষ্মান্ত্য অস্ত্রগণ্ডে নৈশ উপাধিত অভিবিভিত করিয়া লাগিল।

কিন্তু সে যাহাই ভুকক়—কালী নীচে হইতে দোািয়াত ও কলম আনিয়া স্থষ্মান্ত্য সমুখে রাখিয়া বলিল—“তিনি ভাই রাগ করেছেন—এমন করে চিঠি লিখে দাও যে স্তার রাগ পড়ে যায়।”

স্থষ্মান্ত্য কঠিন হাসিয়া বলিল “আমি কি কখন ক্ষুদ্র চিঠি লিখিয়েছি কালী—যে তার মনের মত করে লিখে দেব—তুমি বলে যাও আমি লিখে দিই।”

কালী হাসিতে হাসিতে বলিল—আমি মূর্খ মানুষ আমি কি ব’লব স্থষ্মান্ত্য দিদি—তুমি আমার মনের কথা বুঝে লিখে দাও—তিনি রাগ করেছেন—তিনি বলেন মেয়ে মানুষ শাস্তির কাছে না থাকলে বিপদে পড়তে পারে। তুমি লিখে দাও যে, আমাকে যদিন তিনি যেতে বলেন আমি সেই দিনই হাজির হব।

এই সব মেয়েরা যাহা বলে তাহার সঙ্গে স্থষ্মান্ত্য জীবনের কত বড় পার্থক্য—তাহার চারি পার্শ্বেই যে নারীগণের সহজাত সে দিবা।

৭৬
দুর্গমের সঙ্গীনী

রাজই পাইলা থাকে—তাহার মাঝখানে কতবড় একটা গণ্ডী চারিফ্রেট দিয়া সে নিজের নিজস্বের রাখে বাস করিতেছে—তাহা এই মুহূর্তে স্বর্গমার মনে উদয় হইয়াছে সত্য—কিন্তু অন্তরের এই বিদ্রোহকে সে একেবারেই দূরন্ত করিয়া ফেলিয়া চিঠির কাগজখানা হাতে লইয়াই মুখ তুলিয়াই দোলায় জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা কালী চিঠির উপরে কি লিখিব বল দেখি? বলিয়াই মুখ হাসিল।

কালী রাঙ্গায় উঠিয়া বলিল—তুমি ভালো হইল সুখমা দিদি কি লিখিতে হয় জান’ না যেন? বলিতে বলিতেই সে কালীয়া ফেলিয়া এই অবস্থাতেই বলিল, আমি লেখা পড়া জানিনা বলে আমার কি অবহাই তোমরা কর।

কালীকে কাদিতে দেখিয়া সুখমা অত্যন্ত অপ্রতিভ হইল—কিন্তু স্বামীকে চিঠি লেখা যে তাহার কোন কালে অভাস নাই—কি কথা লিখিলে এই স্বামীর জয়ি সঞ্চাই হয়—তাহা সুখমার যে কোন কালেই জানা নাই—বং কি করিলে সঞ্চাই হয় না তাহ। ভালই জানা আছে—সে কথা সম্বন্ধে ঐ কন্দনরতা মেয়েটাকে বলিয়া কোন লাভ নাই দেখিয়া সে কতকটা গলায় হইয়াই কলম তুলিয়া লইয়া চিঠি লিখিতে বসিল—নিজের স্বামীকে যে কোনও পত্র দেয় নাই—তাহাকেই পত্রের হইয়া। পত্রের স্বামীকে পত্র লিখিতে হইল।

۷۷
হুর্গনের সন্ধিনী

কিন্তু এই সময়েই কি ছাই নিজের যত বেদন। রাশি—নিজের স্নামী-বিরহিত জীবনের করলো রাশি মনের মধ্যে আসিয়া দৃষ্ট বাধাইয়া বসিল কি হইলে সে এমনই করিয়া স্নামীকে পত্র লিখিতে পারিত—কি হইলে এই ক্ষুদ্রকন্দা-সুখভূত সমীরে—উপরকার ঐ নেতে মেদুর আকাশের নীচে এইখানে এই চাদে বসিয়া সে স্নামীর সঙ্কে কথা কহিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিতে পারিত—কি হইলে সমুদ্রের ঐ কালের কোলে যে ছেলেটা। এখনও মাতৃ স্নাম পান করিতেছে লেও তেমন সমস্তনিরূপন। তাহে পারিত—

কিন্তু এই সময়েই কালী বলিয়া উঠিয়া মেদ করে আসুচ্ছে স্নামা।
‘দরদ, ভোজের ছট পায়ে পড়িও কলম লিখে দাও ভাই।’

এই যে দিই কালী—বলিয়া স্নামা পত্র অরস্থ করিল—কিন্তু এই সময়েই তাহার চক্ষ বে জলে ভরিয়া গিয়াছিল—ঘড়ি হইতে করিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় কালী তাহ। দেখিতেও পাইল না ; কিন্তু স্নামী গ্রেম ও সন্তানের স্বেচ্ছা এই অনন্ত মেয়েটাকে হায়ত’ তখন এতবেই বিস্মৃত করিয়া। রাখিয়াছিল, যে দৌজ্জলের এই সব সুখে অঙ্ক হানি তাহার চোখেই পড়িল না।

পত্র সমাপ্ত হইলে স্নামা বলিল, শোনু ভাই, আমরা ভাল লিখিতে চান না—সাদা কথায় চিঠি লিখিছি—তোর মনের কথা হ’য়েছে কি না জানিন।। এই বলিয়া পত্র পড়িল।

৭৮
প্রিয়তম !

তোমার পত্র পাইয়াছি—তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ—আমি যদি দেখি করিয়া থাকি, দাসী বলিয়া মার্জনা করিও—আমি পদাশ্রিত। লতা তুমি বিরুদ্ধ হইলে আমি বাচিব কি করিয়া ? তুমি ত’ কখনও আমার উপর রাগ করিয়া। ধাক্কিতে পার না, আমি আজ দূরে আছি বলিয়া কি বিরুদ্ধ হইয়াছ ? দূরে আছি বলিয়া আমি যে তোমার অভাব শতগুণে বোধ করিতেছি। দূরে আছি বলিয়া রাগ করিও না—দূরেই পারি আর কাছেই থাকি, আমি যে তোমারই—তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ ? তুমি কেমন আছ—পারত’ একবার আসিও—না পার—মেদিন তুমি হক্ক করিবে—সেই দিনই তোমার পদাশ্রিতে পৌছিব !

তোমার একান্ত পদাশ্রিত কালী—

পত্র পাঠ হইলে কালী সলজ্জ হাসি হাসিয়া বালক—মেয়েনাঙ্গ্ল নাকি মেয়ে মানুষের মন বোঝে না—দাও—না আর দেখতে দেব না—জল এসে পড়ল বাই—বলিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল।
দুর্গমের সঙ্গিনী


( ২১ )

উপরে মেহ গর্জন করিতেছিল—ক্ষণে ক্ষণে বিদ্রো প্রকাশ পাইতেছিল—তব সেই অঙ্ককারে—সেই মেঘদলাকুলীত আকাশের নিয়ে স্থষ্য। ছাদের উপর শুইয়া পড়িল। হুরস্ত বাতাস তাহার অঙ্গে গণে অধ্যয়নীয় পদ্ধতি লাগিল; তাহার ধুলা-লুষ্ঠিত অঙ্গকে চঞ্জল করিয়াঃ তুলিল—তবু স্থষ্য। সেই একই স্থানে পড়িয়া রহিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল ঐ যে মেঘেট। স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া পরম নির্যঙ্গে কাল কাটাইতেছে—স্মৃতির পদে আজীবন দাসত্বের গৃহ করিয়াও কোন অংশেই অপরিভূত নহে—
ঐটাই নারীর প্রশস্ত পথ; সংসারের শত ঝন্ডা হইতে দূরে থাকিয়া বিশাল মহীরূপের পদ প্রাঙ্গনে আপনার নিঃসৃত অমর্শম গড়িয়া। লওয়া নারীর মত দুর্বল জাতির পক্ষেই অতঃসু শোভনীয়—সংসারের পাপ তাপ স্বাভাবিকে বহিয়া শত নিদর্শ ভাঙ্গম হইয়া। পুরুষের সমকক্ষ হইতে যাওয়া ও চাওয়া। আর যাহারই পক্ষে শোভনীয় হুদক—স্থষ্য। যে জাতীয়তার বিশাল প্রাসাদতলে গড়িয়া উঠিয়াছে—সেখানকার জন্য নয়। তাহার বৃদ্ধ পিতামহীরা যে সাবিত্রী হইবার লোভেও গৌরবে কোনরূপ অত্যন্ত-বিস্তরকেই ভয় করিতেন না—ব্রহ্ম ও উপরাস।

৮০
ঘৃতকৃষ্ণ ও স্বামী সেবা লইয়া সেকালের নিরক্ষর নারীদের জীবনের অর্ধেক দিন যে অনাহারেই কাটিয়াছে, তাহার প্রমাণ আবিষ্কার করা। নারীদের মধ্যেও যথেষ্ট পাওয়া যায়; কিন্তু তাহাদের জীবন সে ছুঁকে কাটিয়াছে—এমন গল্প ও উপন্যাস পর্যাপ্ত সৃষ্টি একখানিও পড়ে নাই।

তবু তার অজ্ঞাত অমূল্য অশান্তির পাদমূলে আমি বিক্রয় করিয়া বসিয়া আছে, এ যে কোন কুল হইতে প্রাপ্ত সংস্কারের বলে—তাহার আজ পরামর্শ সৃষ্টি। তাহার পায় নাই; তথাপি এই নারী বিখ্যাতদের বিষয়ে সম্ভাবনা পাইয়াছিল—তাহার সন্তান যে সম্বন্ধে সম্ভাবনা রাখিয়া গৃহাশুম গড়িয়া তোলা—নৃত্য শিক্ষা নূতন নূতন সংস্কারে। এই সত্যের যতগুলা সংস্কার হইয়া থাকে—তাহার মূল তথ্য যে এখনও একবারে লুঝে হইয়া যায় নাই, তাহার পরিচয় চেষ্টা করিলেই পাওয়া যায়—ইহা তাহার অবিলম্বিত ছিল না। অবিলম্ব ছিল না যে, যেখানেই নরনারীদের শাসনের শাখিক গৃহ প্রস্তুত করিতে হইয়াছে যেখানেই একজনকে সাহায্য হইতে হইয়াছে একজনের বাধ্য হইতে হইয়াছে এবং পৃথিবীর সকল দেশের সক্রান্তির মধ্যে তাহার পরিচয় পুনর্নতী পাওয়া গিয়াছে। কেন পৌরুষের জন্ম হইয়াছিল জন্ম করিতে, আর সেহের জন্ম হইয়াছিল পালন করিতে। আর এই ছই শক্তি যেখানেই পরম্পর বিয়োগী হইয়া দাড়াইয়াছে, সেখানেই জন্ম ও

৩.
দুর্গামূর্তির সঙ্গীনী

অসম্ভব হইয়াছে—পালনও নির্ধিক হইয়াছে—আর গৃহুঞ্জার আর অস্ত রহে নাই।

এই সব ভাবিতে ভাবিতে স্থমার মনে পড়িয়া গেল যে এই সংসারে সুখ ও দুঃখ পাশাপাশিয়া চলিয়াছে, একটাকে বাদ দিয়া আর একটাকে পাওয়া যায় না—পাইলেও তাহার সমক পরিচ্ছে কিছুতেই পাওয়া যায় না—স্থু দিগের আলো মানবকে চক্ষুপীড়াই দিত এবং স্থু রাজির অস্কার পৃথিবীর পক্ষে একবারে হৃদসহ হইয়া উঠিত। এই সংসারে মানুষ সুখ ও দুঃখে বরণ করিয়াই তঁর জীবনকে হায়তম ক্রীড়া ও কোটুকময় করিয়া। রাজিয়াছে—স্থু সেই অন্নের মত আলোক হইতে বঙ্কিত হইয়া আছে। আজ হইতে স্থমার আর তাহা শ্রাবকে না—মানুষ হইবে। কালীর এই মাত্র দেওয়া শিক্ষা আর সে ভুল করিবে না—সেই ধাম্যের সকাদে যাইবে—তাহার জীবনের সহযাত্রী হইবে—তাহার দুর্গামূর্তির সঙ্গীনী হইবে—গামাতে যে নামের দূর্বিহীনতার জন্য নিজে সারা জীবন অন্ন সাজিয়া বসিয়াছিলেন—হিন্দুনায়ির এই পরম ও চরম শিক্ষার আর সে অপমান করিতে না।

এই সব ভাবিয়া স্থমার যখন উঠিয়া গেলাই—তখনই তাহার অস্ত হইতে কালীর নামের উচ্চভূমে লিপিত রামখানায় পড়িয়া গেল—আর স্থমার তাঙ্গাতাঙ্গি তাহার ফিরাইবার জন্য নীচে নামিয়া।

২২
দুর্গমের সহিষ্ণু
অসিল। কিন্তু কালী তখন চলিয়া গেছে। তবু সে এখনও বাড়ীর
দরজা পার হয় নাই ভাবিয়া স্থবির। বাহিরে অসিল, আর বাহিরের
বাগানটার মধ্যে অসিল। বার দুই ডাকিয়াও যখন সাড়া পাইল না
তখন ফিরিয়াই যাইতেছিল—সহসা পিছন হইতে কে তাহার কৃষক
ধরিয়া টানিতেই স্থবিরি সচকিতে তাহার দিকে ফিরিয়া ধাড়াইল—
আর সেই সময়ে একবার বিচ্ছায় বিকাশ হইতেই দেখিতে পাইল যে,
তাহার সমুখে যে ধাড়াইলা আছে, সে তিনকড়ি।

( ২২ )

উপরে আকাশ গঙ্গন করিতেছিল—নিশ্চয় ধরিয়া অন্ন বরিষণে
অভিষিক্ত হইতেছিল—কণগুলোর কণ-দীপ্তি অদলকারকে প্রতি
মুহূর্তে নিবৃত্ত করিয়া তুলিতেছিল—আর শীতল বাতাস বাগানের
কুলকুলকে সাজীব করিয়া তুলিয়াছিল—তাই তাহাদের মূহূর্ত
মন্দিক্তি গঙ্গনের সর্বদেহেই পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছিল—আর
তাহাদের মাঝখানে এই ছই নরনারী ধাড়াইলাছিল—একজন কুড়া
ফিনিকীর মত ফণ। বিশ্বাসঘর করিয়া—অতঃপর সেই ফলিপীকে বশীভূত
করিবার যাছি মন্ত্র লইয়া।

৮০
ধূর্গমের সঙ্গীনী

বহুদিন পূর্বে এই তিনকড়ি আর এক সম্ভাকালে স্থধার 
পদমাল্ল করিয়া তাহাকে যে ইঙ্গিত করিয়াছিল, তাহাতে তিনকড়িকে 
পদচ্যুত হইতে হইয়াছিল—আর কোন শান্তির অংশ লইতে হয় 
নাই। কিন্তু পুনরায় একদিন পরে সে যে সাহসে অত্যাচার করিতে 
সাহসী হইয়াছে—তাহার ভয় তাহাকে কি শান্তি দেওয়া যাইবে—
স্থধার তাহা ঘির করিতে পারিতেছিল না। উভজনায় তাহার 
আপাদ মাত্রক মূর্ত কর্ম্মত হইতেছিল—সহজে বাক্সনুইতি হইতেছিল 
না। কিন্তু অধিকাংশ এই ভাবে দাড়াইয়া তাহাকে পাছে এই 
দক্ষতা কোনরূপ হ্রদসাহসের পরিচয় দিয়া বসে—তাই স্থধার 
অতিরিক্তকোনে চীৎকার করিয়া ডাকিল তিনকড়ি। 

তাহার কঠিনতরে তিনকড়ি কতকটা দাম্যায় গেল বটে—কিন্তু 
বসন্তর ইঙ্গিত স্মরণ করিয়া একবারে হটিলনা—মূর্ততে বলিল 
“আমাকে দরা কর স্বধার”—তথাপি স্থধার কঠিনতর অবিচলিত। 
রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল “তুমি আমার কেন এসেছ না?”
মিনতির স্বরে হটিলে বলিল “স্থধার আমি তোমায় তালবাসি।”

সম্ভবত সম্ভাবত লাভে মাঝে মাঝে করি তত অত্যন্ত হয় না।
যত অত্যন্ত হয়—সে এই কথা শুনিয়া ক্রতপথে 
হইতেন হাত মিটি। আসিয়া ডাকিল দরোয়ান’।

কিন্তু এই কথা বিখ্যাত হউক—তাহার কঠিনতালু এত

৫৪
প্রকাশিয়া গিয়েছিল যে, সে তাহার কঠি হইতে বাহিরে আসিল মাত্র—
বেশী দূরে যাইতে পারিল না। আর ঠিক এই সময়ে তিনকাড়ি
যাহু মন্ত্র আওড়াইল—সে বলিল 'দরোয়ানকে ডেক'না। স্থযম তাহতে
কলক বাড়িতে কামুক্তি না—আমাদের দুঃখনকে এই অদ্ভূতকরে একক
দেখলে লোকে কি ভাবে বলত ?'

কিন্তু অদ্ধারণ পূর্বেই স্বামীর চিন্তায় স্থযমার প্রাণ পূর্ণ হইয়াছিল
—সে চিন্তাতে স্থৃষ্টিকে শেষ রশ্মিটুকু তখন ও তাহার মন তথকের অভাবন
হইতে অদ্ভুত হয় নাই—তাহ যে কথা গুলীনে প্রত্যেক রমণীই
ভয়ে ও লজ্জায় ফ্রাসড় হইয়া যাইত—তাহায় স্থযমার অন্তর স্পর্শ ই
করিল না। সে সদরে উভর করিল যে, কি মনে করবে ?
লোকে
চোরকে গৃহস্বামীর সম্মুখে দেখলে লোকে যাঁ মনে করবে তাহে—
এই পর্যন্ত বলিয়াই সে বোধ করি 'চোর' 'চোর' বলিরাই চাকতার
করিতে যাইতেছিল—কিন্তু ঠিক এই সময়ে দূর হইতে একটাই আলে।
আসিয়ান দেখিযা তিনকাড়ি ধরা পড়িবার ভয়ে পলায়ন করিল।
আর ঠিক এই সময়েই ধরা পড়িবার ভয় ও নারীর শ্রবণ লজ্জ। এখনই
চোরে আসিযা স্থযমার কঠরোখ করিল যে সে না পারিল 'চোর'
বলিয়া চাকতার করিতে, না পারিল সেখান ত্যাগ করিল। পলাইল।
যাইতে। আর পুন: পুন: বিহ্যাৎ দুঃখিত্ব প্রদর্শিত স্থযমার শ্রুত অবকাশায় নিকেই লক্ষ্য রাখিয। যখন সেই দুরাগত আলোক রেখা।

৮৫
হুর্গনের সঙ্গনী

একবারে বাগানের ধারে আসিয়া পৌঁছিল, তখনও তিনকণ্ডি পলাইতে পারে নাই—এক ঝড় হেনার আড়ালে আশ্রয়ন করিয়া ঝাড়াইয়াছিল।

উপরে বিছাৎ হাঁইয়া হাঁইয়া যাইতেছিল—তাহার গুড় আলোকে গুথু নিকটেই নহে—দুরের জিনিস ও স্পষ্ট দেখ। যায়—কিন্তু সে অগ্রভাগের সাহায্য না লইলেও ক্ষির প্রভাস আলোক সাহায্য যে বাকি উপরে ধবলের করিল—তাহার আর কিছুই দেখিতে বাকী রহিল না। সে যাহ। দেখিল—তাহাতে তাহার বিশ্বয়ের অবধি ছিল না। সত্য—তবু সে নির্বাক বিশ্বয়ে সেখান হইতে চলিয়াই যাইতেছিল। কিন্তু তাহাকে ফিরিতে দেখিয়াই তিনকণ্ডি বাগানের বেড়া অতিরক্ত করিয়া পলায়ন করিল—আর স্বয়ম হঠাৎ বলিয়া উঠিল “ধর—ধর” যে লোকট। আসিয়াছিল—সে স্বয়ম কুলপুরোহিত হইলেও অমুদার-তন্যার এই আদেশ অমাল করিতে পারিল না—আদেশ বাহির হইবার সমে সঙ্গে তিনকণ্ডির পশ্চাদ্ধাবন করিল—কিন্তু তখন তিনকণ্ডি অস্বীকারে মিশিয়া গেছে।

পুরোহিত ফিরিয়া। আসিয়া যখন স্বয়মকে এই সংবাদ দিলেন তখন আগত্যাই সে গৃহে ফিরিয়া গেল বটে, কিন্তু এই তিনকণ্ডির অবির্ভাব উপলক্ষ করিয়া তাহার মন এমনই আঘাত পাইয়াছিল যে, কাজীর দ্বারের উল্লেখে নিষিদ্ধ থামানা। কখন যে তাহার হাও
চুর্গমের সন্ধিনী

হইতে পড়িয়া গেছে, তাহা সে কিছুই জানিতে পারে নাই। এমনই হতরুদ্ধি হইয়া সে উঠানবাটি তাগ করিয়া গেছে।

কিন্তঃ সেই খামখানায় প্রত্যাবর্তন কালে পুরোহিতের চক্ষে পড়িয়া গেল। আর এই সত্ত্বা কি তাহা দেখিবার অন্ত উঠাইয়া সহিতেই সবিস্মায়ে দেখিতে পাইলেন যে, তাহাতে মেয়েলী অক্ষরে বেশ স্পষ্ট করিয়াই লেখা রহিয়াছে শ্রীলুক্ত তিনক্যান্তি বটবাল।

কালীর নাম এই নিকুঠি, তাহা পুরোহিত বুঝিলেন না। শ্রুত্ত্বার কার্য্য ও চরিত্র সম্পন্নে মন্তাকে একাবারে কালী করিয়া লইয়া ফিরিয়া গেলেন।

(২০)

কিন্তঃ সে যাই হউক—এই রূপেই আছে ও অপমানিত মন লইয়া শ্রুত্ব। যখন নিজের গৃহে ফিরিয়া আসিল, তখন বাহিরের অবিরল জলধারার মত তাহার চক্ষে জলধারা নামিতে ছিল। নিজেকে শুকির মত কষ্ঠ আবরণে আবৃত রাখিলেও তাহার নিত্য অন্তরে নারীদের দৌর্বল্য একাবারে মরিয়া যায় নাই বলিয়াই বিপদে ও বিপ্রেতি নারীর যাহা একমাত্র সম্পল,
ছুর্গমের সন্ধিনী

সেই অশ্রুই তাহার চক্ষে ভাসিয়া উঠিল। আর এতদিন পরে
শ্রামীহীন। রমণীর নিঃসহায় অবস্থা তাহার মানস চক্ষে ফুটিয়া উঠিল।
এমন কি রিত বিতাড়িত দরিদ্র বীরেশ্বরকে দেখতা বলিয়া সমৃদ্ধে
করিতে ও তাহার মন সক্ষুচিত হইল না। সে দর-বিগলিত অশ্রু
লইয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, কোথায় আজ তুমি দেবতা, তোমার
পতিত। অপমানিত ধন্যপদ্মীকে ফেলিয়া। কোথায় রঘ্যায়? আমি
অপরাধ কার্যবাহিলাম বাল্য। তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া গেলে
কেন? কেন আমায় শাসন করিলে না, শাসনে তোমার পদানত
করিলে না?

হায় রে, না যে দিন আগাত পায় সে দিন সে এমনই করিয়াই
অশ্রু তাগ করে বটে, এমনই করিয়াই কাদিয়া কাদিয়া পরকেও
কাদাইয়া থাকে সত্য, কিন্তু সে যে দিন নিজের নারীত্বকে অতিক্রম
করিয়া পুরুষের বিরুদ্ধেই খড় তুলিয়া বলে। সে দিন অবস্থার পরিবর্তন
না ভুটে পারে সে কথা একবার শ্রবণ মাত্র করে না।

কিন্তু সে যাহাই হউক এই দীর্ঘ ও হংসহ জীবন লইয়। স্থিরতা
যে আর এখানে থাকিতে পারিবে না, অন্ত কিছু শুক্র হউক না।
হউক এই কথা একবারে শির হইয়া গিয়াছিল। সংসারে আর্থিক
অবস্থা তাহার যতই স্বাভাবিক হউক, সাংসারিক জীবনে সে যে
একবারে নিঃসহায়, একথা জানিতেও আর কাহারও বাকী ছিল না।

৮৮
তাহার পিতা নাই, মাতা নাই, স্থানীয় ধর্মিকাও নাই, সংসারে নারীর সব চেয়ে বড় আশ্রম বাহার। তাহাদের মধ্যে কেহই নাই; শুধু রূপ আছে, যৌবন আছে, আর অর্থী পিতার পরিত্যক্ত অর্থ আছে। অসহায় নারীর জীবনে দুর্গতির সূল মেজলা, সবই বর্তমান আছে, কিন্তু নারীজ্ঞের সম্ভাবনা পর্যাপ্ত ক্ষুদ্র হইতে বসিয়াছে। আজ যদি স্ত্রীমার মা থাকিত? তাহা হইলে এই স্ত্রীমার মা থাকিত? ও বেদনায় আঘাতে তাহাকে বাচবিদ্যা হরিরির মত শেষ নিঃসার। তাহাঁকে করিবার জন্ত তাহার নিভৃত বেষ্টনি আশ্রমে আসিয়া প্রথমতঃ করিতে হইত না; জননীর অঙ্গে এই অন্তরাশিকে একবারে লুকাইয়া ফেলিতে পারা যাইত।

তাহা হইলে এই যে কলঙ্ক আজ একাধু মিথ্যা। হইয়াও সত্যুপে স্ত্রীমার কুলপুরোহিতের চোখে পড়িয়া গেল, তাহাকে মিথ্যা বলিয়া। প্রমাণ করিবার যে অগ্রিমপুরীক্ষা এখনও অবশিষ্ট আছে, তাহা স৊ধ্য করি সমারোহ না করিয়াও স্ত্রীমার হইত। কিন্তু এখন পুরোহিত তাহাকে যতই শেষ করিব এবং তাহার পিতার অন্ত্রে প্রতিপালিত বলিয়া যতই সমান করিব, স্ত্রীমার চরিত্র সম্বন্ধে তাহার যে সমীক্ষ নিশ্চয় জ্ঞমিয়া গেছে, তাহ। দূর করা যেমন প্রয়োজন, তত্বনই কষ্টসাথে হইবে তাহা বিশিষ্ট স্ত্রীমার বাকী রহিল না। তাই বাহিরে যে বৃষ্টি তখনও পড়িতেছিল, তাহাকে উপেক্ষা করিয়াই স্ত্রীমার একজন

৮৯
চুর্গমের সঙ্গীনী

পরিচারিকাকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরে গেল আর 'আরন্থ আরণ্থি' সমাপ্ত হইলে প্রোহিতকে নিজের ভাস্কিয়া সেদিনকার সম্প্রদায় ইতিহাস পুলিয়া বলিয়া বলিল “কাক। আমি এইবার তীর্থে বাস কর্ষ্য মনে করেছি।”

প্রোহিত এ কথায় একবারে চঞ্চল হইয়া উঠিয়া বলিলেন “সে কি কথা মা এই বয়সে তুমি তীর্থে যাবে কি ?”

স্বৰ্গমা মাথা হেট করিয়া বলিতে লাগিল “পুরুষ কাকা—বাবা মারা যাওয়ার পর আমি যে কাজ এতদিন ক'রে এসেছি তা'তে অভ্যন্ত অহঙ্কারের পারচয় দিয়েছি। আমি বড় লোকের মেয়ে ছিলাম, বাবার কাছে আর তোমাদের কাছে সেহ ছাড়া। কোনদিন শাসন পাই নাই, তাই নিজেকে অভ্যন্ত বড় ভেবেছিলাম, ভেবে কত অস্ত্যাবাহ করেছি। কিন্তু আজ ঠেকেছি, দোষ করেছি বলে তোমরাও ত আমাকে উপদেশ না দিয়ে দুরেই রেখে দিয়েছিলে। কিন্তু সে যা হ’ক আজ আর আমি তুল কর্ষ্য না ; যার কাছে খুব দোষ করেছি তা'কে একবারে ফেরাতে চেষ্টা কর্ষ্য। না পারি আমিও আর ফিরবেন। কাকা, তিনকড়ি আমাকে অপমান কর্ষ্যে সাহস করে? আর তোমরা তাই ধীরভিয়ে দেখবে? বলিয়া স্বৰ্গমা কাঁদিয়া ফেলিল।

স্বৰ্গমাকে কাঁদিয়ে দেখিয়া প্রোহিত একবারে একত্র হইয়া
দুর্গামের সতর্কীকরণ

উঠবে বলিয়া—না না, মা, কাল তিনকড়ে বেটা বেঁধে নিয়ে এসে চাবকে ছাড়বে! ও ছোট লোক বেঁটা ত এখানে ছিল না কাল নাকি এসেছে, আচ্ছা কাল ওকে দেখে নব।

স্বর্ণী। তখন চোখের জল মুছিয়াছিল। সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, না কাকা কাল ওকে দেখে আর দরকার নেই, তাঁতে আমার লজ্জাহই বাড়বে।

তাহীত' মা সে কথাও ত' বটে। আর এই জন্মেই ত' এই সব ছোট লোক বেঁটার এত বেঁড়ে ওঠে। আর এটা, স্বর্ণী, আমি কখনও না কখনও নিশ্চয়ই পাব। তখন আমি কিছুতেই ওকে ছাড়বো। না তা তুমি দেখে নিও।

কিন্তু পুরোহিত তাহাকে লইয়া যাহাই করুন এবং স্বর্ণীকে যাহাই দেখিয়া লইয়া ইত্যাদি, সে বিষয়ে এখন আলোচনা প্রয়োজন নাই যে দেখিয়াই স্বর্ণী বলিল, আমি বলুচি কি কাকা আমি যদি কিন্তু আমি আমার এই সম্পদে তুমি পুরোহিত তুমি দেবসেবার জন্ম রাখবে আর বাকি ব্যবস্থা আমি সব কর'বায়।

কিন্তু তুমি আমাদের ছেড়ে কেন যাবে মা! আমরাই গিয়ে জামাই বেটাকে খুঁজে নিয়ে আসুচি—বলিয়াই হঠাৎ তাহার মনে পড়িল যে একবিংশতে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়াও শক্ত; তাই কথাটা একটু ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন যে, তোমাদের এই ঝগড়ার
হুর্গমের সঙ্কিনী

মধ্যে আমরা কি থাকতে পারি মা? কিন্তু সে যাই হোক এখন সে
বেটা কোথা আছে ব’লে দাওত’ তাঁকে ছদ্ধিনের মধ্যে ধরে নিয়ে
আসছি।

নিবিড় জলদ জালের মধ্যে একটুখানি বিদ্যাধরের আঁধা
অকাশের মত স্থলমার অধরে একটুখানি সলজ হাসি দেখা দিল,
সে বলল তা’কে আমি শক্ত কাকা কোথায় আছে তা’ও আমি
ঠিক জানিনা, যে ঘর ছেড়েছে সে কি এক জায়গায় ব’সে আছে।
কিন্তু সে যা’হোক আমারও ত’ ঘর ছাঁড়বার সময় হ’য়েছে কাকা।
তুমি কাল একবার খুড়ীরাকে পাঠিয়ে দিও, যাবার আগে একবার
তার পায়ের ধুলো নেব। আর সেবারকার পুজোর সময়কার
গর্দনের শাড়ীটা তার পাওনা আছে, সেটাও দিয়ে দেব। এই
বলিয়াই স্থস্ম পুরোহিতকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাড়াইল।

পুরোহিত একবারে শব্দযুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, হঘেছে মা
হ’য়েছে মা, আর প্রণাম কর্ত্তে হবে না, আমি অশীর্বাদ কর্ত্তি
তুমি জামাই বেটাকে ধরে নিয়ে ঘরে এস।

স্থস্ম যাইতে উদ্ভত হইয়া সহসা ফিরিয়া দাড়াইল। দাড়াইয়া
বলিল আছে কাকা, এ আমার কি হর্কুর্দি হ’ল ব’লতে পারো, কবে
কোনো ছেলেবেলায় আমি কাশী গিয়েছিলাম, সেখানে একদিন
গণ্ধারন কর্ত্তে যাবার পথে একজন গন্ধকার আমার হাত দেখে

০২
দুর্গমের সঙ্কিনী

বলেছিল যে, আমি স্থানীয়াতিনী হব। তখন আমার বয়স ত্র্য মাস দশ। কিন্তু সেই দশবৎসর বয়সের কথা আমি কোনদিনই ভুলতে পারি নাই, আমি চিরচিনই স্মারকে দূরে দূরে রেখেছি, পাছে আমি কোনরূপে তাঁর অমঙ্গল করে বসি! আর যেদিন তিনি চুলে গেলেন সেদিন সেই জঙ্গ আমি বিশেষ বিচলিত হই নাই; আমার বিশ্বাস ছিল যে, আমি কাছে না থাকলে তাঁর অমঙ্গল হবে না। কিন্তু আজ এই দেবমন্দিরে খাড়িয়েও আমার বুকের ভিতরটা কাপেছে--কি জানি কি হবে।

প্রোচ্ছিত লোকটি ছিলেন একটু অতিমাত্রায় সরল—তিনি অতিনক্ষুড়ের নামে লেখা খামখানা দেখিয়া যে পরিমাণ বিরক্ত হইয়াছিলেন—ক্ষমার এই সমস্ত কথা। জুনিয়া সে সব ভুলিয়া একবারে অতিশয় বাগ্ন হইয়া উঠিলেন—বলিলেন ‘বটে মা—বটে, এর ভিতরে এতক্ষণ আছে—তাই ত’ বলি আমাদের রমেশদাদুর মেয়েটা এখন হ’ল কেন? হ’লাই বা তিনি জমিদার—তিনি যে কি প্রকৃতির লোক ছিলেন—তাত’ আর আমাদের অক্ষা নাই কিনে? এর ভিতরে এতক্ষণ যে আছে, তা’ বেটী এতদিন কি কাউকেও বলুতে নাই? একটা সম্ভাবনা ক’রে দিলেই যে হাঙ্গামা—হায়! হায়! হায়! এই পর্যন্ত বলিয়া বোধ হয় রাজা গন্তব্যের হুইয়াছে দেখিয়াই তাহার প্রাপ্য শীতলের নৈচর্যগুলো গায়েছায়।

৯৩
দুর্গমের সজলমী

বাধিতে লাগিলেন এবং বাধা প্রায় শেষ হইলে বলিলেন—আজ্ঞা আমি কালই তোমার খুড়ীমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—সে তোমার বুঝিয়ে স্থীরিয়ে যাবে এখন। দেখ দিকিন মা, এ সমস্ত কি ছেলেমানুষীকরে বাণে বসে আছ।

স্থরমার হয়ত আরও কিছু বলিবার ছিল—কিন্তু ব্যাধিতাকে বাণিজ্য উভয়ের দেখিয়া সে পথ চালিয়া দিল।

আছামা, তুমি বাণিজ্য যাতে রাত হয়েছে। বুঝিয়া থাকে এই বেলা। আমিও চলে যাই—কালই তোমার খুড়ীমাকে আমি পাঠিয়ে দেব, বলিতে বলিতে তিনি প্রহার করিলেন। কিন্তু আজ্ঞাকার রাজের ঘটনাটা কারও কাছে প্রবাহ করিতে নিষেধ করিবার কথাটা স্থরমারও ওঠাগে আসিয়াও থামিয়া গেল—পুরোহিত অনুরণিত হইলেন।

( ২৪ )

কিন্তু ভারপরও স্থরমার বহুক্ষণ সেই দেবমন্দিরে থুঁটে দেবতার কৃষ্ণ ঘাঁরের বাহিরে বসিয়া রহিল; বোধ করি সেদিনকার সঙ্গায় ঘটনাটা তাহার অন্তরে তখনও মুক্ত কম্পন জাগাইয়া রাখিয়াছিল,

৯৪
পৃষ্ঠের সমাপ্তি

বৃষ্টি তাহার অপমানিত নারীতাতে আজ অপমানিত—অপমানের কশাকাটে দুরে-প্রেমিত থামীর পতঙ্গের সুষট্ট হইতেছিল—তাই দেবমন্দিরের পরিত্র আবেগের সংস্পর্শে সে তাগ করিতে পারিতে ছিল না।

এ কথা সত্য বটে, হৃদয়ের যখন দশ এগার বৎসর বয়স, সেই সময় সে তাহার পিতার সঙ্গে কাছাকাছি ছিল। একদিন প্রাতঃকালে তাহাদের বুক। এক পরিচারিকার সঙ্গে গঙ্গায় ঝাঁক করিতে যাইবার পথে এক জ্যোতিষী তাহার হাত ধরিয়া বলিয়াছিল যে, এই মেয়েটপাটন সবই সন্দেহ, শুধু তাহার ব্যাঙাহং হইবার লক্ষণ রহিয়াছে—এই একটা বড়ই অসংলগ্নের চিহ্ন—নহিলে এই মেয়েটার লক্ষণগুলি সবই তাল।

কিন্তু সমস্ত স্থলক্ষণের মধ্যেও যে লক্ষণটির কথা জ্যোতিষী বলিয়াছিল তাহাতেই শুধু পরিচারিকা নহে স্বং স্বস্ম। পর্যাপ্ত শিখিয়া উঠিয়াছিল এবং শেষ পর্যায় কি করিলে এই অসংলগ্নের পরিসমাপ্তি হইবে জানিতে চাহিলে জ্যোতিষী নাকি বলিয়াছিলেন যে বিবাহ দিতে বিলাপ করিলেই তাল হয় এবং তাহার যুদ্ধ সম্ভব না হয় তাহার হইলে অন্তরে কিছুকাল থামীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠত না রাখিলে হয়তো শুদ্ধ মাত্র একটু শোকিতপাড়েই এই শুদ্ধ লক্ষণের অবসান হইতে পারে।

কিন্তু থামীর শোকিতপাড়েই মেমোর রাঢ়নীয় নহে, বিবাহিত।

১৫
ছুর্গমের সজ্জনী

জীবনে ঘনিষ্ঠতা না রাখাও তদধিক অনভিপ্রেত, ইহাও যে কেহই রুবিতে পারে। কিন্তু ইহা সত্য হইবে কি মিথ্যা হইবে এবং সত্য হইলেও তাহা কতিপয় সত্য তাহার কিছুই ঠিক ছিল। বলিয়া সে কথা আর কাহারও কাছে প্রকাশ করা হয় নাই, করিয়াও কোন লাভ ছিল না। কিন্তু এতদিন মহোম। তাহার বিবাহিত জীবনে যে অবস্থার মধ্য দিয়া পথ চলিয়াছে—এবং জীবনের মধ্য পথে যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাকে বিবাহিত জীবন না বলিয়ালো চলে; এবং সৌম্যের সিদ্ধুকে আয়ত উজ্জল রাখিয়া এই শ্যামী-বিরাহিত জীবন শুদ্ধ মাত্র লাঙ্গল। নয়, লোকজ্ঞার অতি বড় কেশবশাল—এ সত্য বাণ আর তাহার কাছে অপরিচিত নহে।

তাই ভাবিয়ে তাহাও নিবাসিত করিয়া মহোম। আজ শ্যামীর সঙ্গানে চলিতে প্রস্তুত হইয়াছে। শ্যামীকে ফিরিয়া পাওয়ার মধ্যে দিয়া আছে সত্য, এবং মহোমার সঙ্গে তাহার অকল্যাণ হইবার সত্যাবন্ধ আছে জ্যোতিসীয় এই পথই গণনা ছিল। কিন্তু তথাপি সে সমস্ত অকল্যাণকেই বরণ করিয়া পথে বাহির হইবে—শ্যামীকে ফিরিয়া পাওয়া সত্য না হইলেও অনিৰ্ব্বাক তাহার অম্বিত করিয়ে, আর তাহার অকল্যাণ হইলে নিজে সে অকল্যাণের অংশ লইতেও দিখা করিয়ে না। এখানে এই পিঞ্জরাবাঁধ বাণ্ডর মত বলিয়া ভেকের পদাঘাত সহিতে না—সে বিষয়ে হৃদয় তাহার একেবারে প্রস্তুত হইয়া গেছে।

৯৬
হুর্গমের সন্ধিনী

তাই পরদিন প্রাতে উঠিয়াই শ্রীমা নায়েকে ডাকিয়া কতকগুলি অত্যাবশ্চক ব্যবহার কথা বলিয়া দিল—আর সে চলিয়া। যাওয়ার পর যদি কখনও বসত ফিরিয়া আসে—তাহ। হইলে এই জমীদারীর আয় হইতে তাহাকে প্রতি মাসে একশত টাকা বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা কাগজে কলমে সহ করিয়া দিয়া। নায়েকে সাক্ষী স্থানে সহ করিতে বলিল। নায়েব কতকটা বিশ্বাস হইয়াছিল বটে,কিন্তু প্রভু কল্যাণের ইচ্ছাতে বাধা দিল না। সই করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আর কিছু হকুম আছে মা?

শ্রীমা লজ্জিত হইয়া বলিল “আমাকে হকুম কর্তার কথা বলবেন না জেটামশাই, আপনি আমার বাবার বড় ভাইয়ের মত। বসন্ত আমার বড় উপকার ক’রেছে তা’কে আমার কিছু দেওয়া উচিত। তাই আপনার উপর এই ভাব দিয়ে যাচ্ছি। এই জমীদারীর ভার তা’ আপনাদের উপর রইল। আমিত’ আজ আপনাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি, আর যে কাজে যাচ্ছি তা’তে আপনারা আমায় বাধা দেবেন না। কিন্তু আমার একটা শেষ ইচ্ছা আছে, সেটা কি আপনারা আমার কথায় পূরণ করবেন?” বলিয়া কতকটা অসহায় ভাবে নায়েবের মুখের দিকে তাকাইল।

নায়েব এই পরিস্থিতিতে গমনোদ্যুবী নেড়েটার প্রতি কতকটা অন্তঃপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া। সেহপূর্ব্বেরই জিজ্ঞাসা করিল “তোমার কি ইচ্ছা বল মা?”

৯৭
হুর্গেমের সঙ্গীনী

স্থষ্মা অল্পক্ষণ চূপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আজ্জ বৈকালে সমস্ত গ্রামবাসীদের সমুদ্রে তিনকড়িকে ধরে এনে পূর্ণি বা বেত মার্কো হুক, আমার একথা থাকবে কি?

নায়েবের বিম্বিতের বোধ হয় অতুল ছিল না। কিন্তু এই জমিদার তনয় জমিদারের মত ভেজ দেখিয়া প্রদত্ত গ্রীষ্মে লেপেল হইয়া। উঠিল, আর প্রাণ হাসযুগেই জবাব দিল, তোমার ইচ্ছা অপূর্ণ থাকবে না মা; তুমি যে আজ সত্যই একটা বড় কাজ করে চেয়েছ, তার সকাল সত্যই পেলাম; পেয়ে বীর্ধ হয় ধন্য হুলাম। এই হিসেব না দিয়ে যদি তুমি চলে যেতে, তাহলে তোমার সম্বন্ধেই উদরে যাওয়া একাটি মিথ্যা যাওয়া হত। তোমার এই অন্তরোধটাই সব চেয়ে বড় হুকুম। তুমি যে শুধু মেয়ে মানুষের নও, জমিদারের মেয়ে আমার আজই লোককে জানিয়ে দিচ্ছি—বলিয়াই নায়েব চলিয়া গেল।

অন্যদিকে গ্রামবাসী অর্কে নরনারীর সমুদ্রে তিনকড়ির শাতি হইয়া গেল—আর তাহার ভাল মন সমালোচনা শুধু নারী মহলে নয়, পুরুষ মহলে এমনই উত্তেজনার সৃষ্টি করিল, যেন এক কুঠি শাক্তিময় গ্রামে সহসা বিনা বিচারেই একজনের ফাসি হইয়া গেছে। তাই পাঠালার পশ্চিম হইতে লোহা পেটা কর্ষ্কর পর্যায়ে রাজের কাজ কর্ষ্ক বন্ধ করিয়া পর্যাপ্তে দল বাহিয়া বসিয়া। এই একই কথার
দুর্গমের সঙ্গীনী

সদর্থ ও কদর্থ করিয়াছে এবং যতক্ষণ না প্রত্যেকেই যুমে অভ্যন্তর কাতর হইয়া পড়িয়াছে, ততক্ষণ কেহই সে স্থান তাগ করে নাই। আর অম্পুরের স্থানে স্থানে এই একই কথায় অন্তঃপূর্ণ পরিসমাপ্ত আত্মার প্রত্যেকেই চাপান স্বর্য ও বিদ্যুত প্রকাশ করিতে করিতে এমনই তুমুল কোলাহল তুলিয়া ছিলেন যে, তাহাতে গুহু তাহাদের প্রত্যেকের রহস্যশালা অত্যন্ত থাকিত হয় নাই, আর পাশে গ্রামের লোকেরা অগ্রিমের কলন্ত করিয়া হৃদ হয়। ছুটিয়া আলিয়াছিল।

কিন্তু এইখানেই ইহার অবসান হয় নাই, প্রত্যেক গৃহস্তেই খাইতে বসিয়া গৃহিণীকে ভর্সনা করিয়াছেন, আর রাত্রে শিশুরা কাঁদিলে প্রত্যেক জননীই তিনক্ষতির শান্তির কথা বলিয়া তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়াছেন। সমস্ত গ্রামে সে রাত্রে এমনই এক বিভূষিতা গ্রামবাসীকে সম্পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল।

কিন্তু পরদিন প্রসন্ন নবীন মুখ্তিতে প্রভাতের উদয় হইল; প্রভাত অরণের তরঙ্গ আলোকে ধরিত্রীর সর্ব অঙ্গ তেমনই স্বর্ণোজ্জ্বল হইয়া উঠিল; সিন্ধু-তৃষণা উষা প্রসন্নহাতে তাহার অরণ-ক্ষিয়ার চক্ষু সাড়াধানি সর্বগুর্দে তেমনই করিয়া জড়াইলেন। আর সেই সময়ই গোরিক-বসনধারিণী স্নৃষ্মা তাহার আজমের পরিচিত গ্রাম আশেশবরে বেলাভূমি পিতৃগৃহ ও পিতার জমিদারী তাগ করিয়া চলিয়া গেল।

৯৯
হুর্গমের সঙ্গীনী

পশ্চাতে রোকালমা সাদাদের দাঁড়িয়েছিল বটে, কিন্তু পাছে
তাহাদের সামনা দিতে গিয়া নিজেই সর্বশহরের কোনদিনী। ফেলে, তাই
সাহস করিয়া। শ্রমী তাহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিতেও ছিল না।

কিন্তু গ্রামপ্রান্তে আসিয়া গ্রাম হইতে ও গ্রামের অধিবাসী-
রন্দের কাছ হইতে যখন জমের মত বিদায় লইতে হইল, তখনই
বিজেদের বাতনা তাহার চক্ষে অশ্রু ধারণ হইল। ছুটির দিল।
সে স্বাস-
নেত্রে একবার পশ্চাতে চাহিয়া সকলের কাছ হইতে বিদায় চাহিল
এবং সে স্বাসী অমৃতের বাতনা মাখাইয়া পালিল। সে আবার
ফিরিয়া আসিবে; গ্রামের সঙ্গী ও সাদাদের তাহার যেন ভুলিয়া না
খায়—এই পবিত্র বলিয়াই গাড়োয়ানেকে গাড়া ইঙ্গিত হইতে বলিল।
পশ্চাতে দুইজন মানুষ পাইক যে তাহার সঙ্গে চালিল তাহার অর্থ
করি সে লজ্জায় করিল না।

আর সৌভাগ্যে অভাবপরে গ্রামের যে পরিমাণ তাহার হইয়াছিল—
কৃষিমার পশ্চাতে দলবি ভাবে যাহারা দাড়িয়া। রহিল—তাহার
প্রাপ্ত যাহার বলিয়া থাক—সেদিন তাহাদের হাঁক যে তাদের চেহারে কম
হইয়াছিল, তাহাদের সকল চেহার দেখিয়া তাহার কিছুতেই বোধ করা
গেল না। কারণ মানুষ তাহার একদিন হয়ত। অপথ হর্ষম
দিয়াছিল কিন্তু আজ তাহার এই বিদায়কে উপলক্ষ করিয়া বেহুলায়
বিসর্জন হইয়া গেল, এ কথা তাহাদের মুখ দিয়া বাহির হইয়া ছিল।

১০০
স্থষ্মর জীবন যেখানে অরস্থ হইয়াছিল, যেখানে তাহার জীবনের প্রায় সমস্ত কর্মক্ষেত্রই অরস্থ হইয়াছিল এবং শেষে হইয়াছিল সে সকলের আজ প্রায় একসদ্ধেই অবসান হইল।

ক্ষুরীর সমক্ষে অনিশ্চিত ধারণা লইয়াই সে পথে বাইর হইয়াছিল, স্ত্রীরাং সেদিক হইতে কোন বেদনাই তাহাকে পীড়িত করিতে পারে নাই। কেবল বসন্তে এই অন্ধকার গমনকালে তাহার সংস্ত চিকেও পুনঃপুনঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছিল। আর সে যে স্থষ্যর বিদায় ক্ষেণ একটি অঞ্চল অন্তবিন্দ করিল না, জানিতে পারিল না যে, স্থষ্যর আজ সত্যই ক্ষুরীর সমক্ষে চলিল এবং জন্মের মত চলিল, এই আঞ্চলিক তাহাকে বারবার পীড়িত করিতে ছাড়িল না।

কিন্তু বসন্তে সে ঠিক সেই সময়ই তাহাদের মিলনের অগ্রদূত হইয়া বহুলুকেই কর্মক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, আর স্থষ্যর কেবল সেই পথেই টানিয়া আনিবার জন্যই তিনি করিতে করিতে করিতেই জন্মর নাই, তাহা যদি স্থষ্যর জানা থাকিত তাহা হইলে আজ হইত’ তাহার ভূতের প্রভুত্ত প্রভুত্ত দেখিয়া প্রভু স্বীয় অন্ত থাকিত না।

১০১
দুর্গমের সঙ্গীনী

কিছু বসন্ত যাহা মনে করিয়া গিয়াছিল কথ্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ঠিক তাহার বিপরীত দেখিতে পাইল। তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির যে পথটা সে কতকটা স্নোম ভাবিয়া লইয়া যাত্রা করিয়াছিল গভীরবাহ্য পেঁচিয়া দেখিল যে, তাহা একবারে দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম যেদিন সে প্রথমে দেখিতে আসিয়াছিল, সেদিন প্রভুত তাহার প্রণয়িনীর মধ্যে প্রেমের জোয়ার পূর্ণ বেগেই ছুটিতে দেখিয়াছিল, কিন্তু আজ তাহাতে একবারে ভাটা পড়িয়া গেছে। কারণ এই তৃণ বিভিরণ শ্রেণীর নরনারীর সঙ্গীলে সেদিন এক শিশুর আর্নি হইয়াছে, আর তাহারই জন্য এই গুল্ম সংসারে কুপিত বৃহৎ অশাংস্তের অর্থ রহে নাই।

যুবিধা পাইলে অন্তরে করিতে নর ও নারী কেহই ছাড়ে না বটে, কারণ অন্তরের আপাধ মধুর আকর্ষণের মোহিনী শক্তি সাথে করিয়া দিতে পারে, অতি মানুষ ছাড়া অন্য কাহারও মায়া ও শোনিতে পোধ করিয়া সে শক্তি আজ আর অর্শিষ্ট নাই। তাই অন্তরের প্রথম আকর্ষণ যেখানেই মানুষকে এখনো করিয়াছে, সেখানেই কি নর কি নারী পরম্পর একবারে হইতে হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু অন্তরে যেখানেই স্মৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া দাঃ বিশ্ব আনন্দ করিয়াছে, সেখানেই মতবিরোধ হইয়াছে এবং পূর্বকার প্রতিষ্ঠিত শান্তি ও মিলন একবারে ফিরিয়া পড়িয়া গেছে।

১০২
তাই সেদিন সেখানে নিতানিত তুফান ছুটা যাইত, আজ সেখানেই প্রতি কথায় ভাটা আসিয়া পড়িতেছে, আর অশ্রু কোথায় অবধি নাই।

কারণ এ সংসারে প্রেম যতখানিই গাক দারিদ্রের ত’ অত্য ছিলনা। আর দারিদ্র সেখানেই প্রেম হইয়া আমাকাস্তি করিয়াছে সেহের প্রেম সেইখানেই মন্তক অবনত করিয়াছে। প্রেম মুদ্র ও মহৎ এ কথা অবিকার করিবার জো নাই, কিন্তু আমাহার প্রেম বহুদিন স্থায়ী হইয়াছে তাহার এতবড় গুণের কথা আজ পর্যায়ে শোনা যায় নাই।

কিন্তু শুধু এই শিক্ষা আবির্ভাবই এ সংসারের কর্তা ও গৃহিণীর ভায়ান্তর আনন্দ করে নাই। মৃদুমার ও সন্ত যেদিন আসিয়া বীরেশ্বরের উপর আশ্রয়ভিত্তি করিল, সেইখানে হইতেই এই তাই নরনারীর প্রেমের বাধ্যে শিখিল হইতে আরস্ত করিয়াছিল। কারণ যাহার উভয়ে উভয়ে নিরাধার ও নিরলস জনে আশ্রয় করিয়াছিল তাহাদেরই একজনের যখন দ্বিতীয় আশ্রয় মিলিল, তখন অত্যপক্ষে বে আশ্রয়ভিত্তি অনুশাসন করিবে এ ঘটনা। একেবারেই বিচিত্র নয়। তাই মুনিয়। যখন দেখিল যে, সে যাহার অবলম্বন করিয়াছে সে একেবারে নিরলস নহে—তখনই তাহার ভবিষ্যৎ ভাবনা আসিয়া জুটিল। এহেদিন তাহার এ সংসারের সকল সেহের শক্তি হইতে মুক্ত হইয়া মুক্ত গগনের পৃথিবীর সমস্ত জটিলতা ও কুটিলতার সম্পূর্ণ

১০৩
হুর্গেমের সঙ্গীনী

একাধিক তাহাদের নিত্য আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছিল। সেখানে তাহাদের স্নেহ করিতে ও শাসন করিতে শুধু তাহাদের হৃদয়ে ছাড়া আর কেহই অবশিষ্ট ছিল। প্রভাত সূর্যের করণশ্রী হইতে নৈশ জ্যোতির্ভার সোণালী আলো এবং কুড়িটিকা হইতে কৃষি ঝটিকা। তাহাদের কুটীরের উপর সমাধানের শাসনমণ্ডল চালাইয়া গেছে। তাহাদের এই একাধিক একাদশ জীবন তাহাদের পূর্বেরার প্রাণীকে লইয়া। এতদিন এক নির্বিচ্ছিন্ন স্থগন্ধি ও সরল বিশালে কাটিয়া গেছে।

কিছু স্থায়ী বসন্তের আবির্ভাবের পর হইতে সেখানে দিনে। আদি জুটিয়াছিল; সেদিন হইতে হাসিতে গেলেই কল্যাণ আসিত। আর কাপ্তার গলা টিপিয়া ধরিলে আর কিছুই আসিত না। বেশ দূর্দিবে—অতিদূরে এক কীৰ্ত্তি অমঙ্গলরেখা কৃষ্ণ ভূমিশিখার মত আয়তন রক্ষি করিতেছে বলিয়া মনে হইত, আর অন্তার অন্টরালে দাড়াইয়া আশ্চর্যতা করিতে চাহিত না।

কিন্তু এই সময়ই এক শিশু আদি। তাহার মাতা ও পিতার মধ্যে যে নব বন্ধনের স্থচন করিল, তাহাই হয়ত আর একদিন পূর্বের সরল বিশালে পরিণত হইত; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কঠোর দারিদ্র্য আদি। কঠো নিপীড়ন করিল, আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় সে যেখানে ছিল পৃথিবী স্বর্গক্ষেত্র করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিল না।

১০৪
হাওয়ার, স্বপ্ন ও অবর্তী মাঝেরকে হাঁই করিয়া দেয় সত্য, কিন্তু তাহার অধ্যায়ন যে স্বর্গবিধি বৈধ দীনতার ও এত নীচে তাই। বোধ করি গ্রামের ভাবান্তর আদি বলিয়া কন্ত বিশ্বাস করিত না।—কিন্তু স্বচ্ছতাতিক তাহার পুঙ্খাপাদ। প্রভুর যে অচলন সে অঙ্গ প্রত্যক্ষ করিল—তাহাতে তাহার দূঃখ ও লজ্জার অবধি রক্ষিল না। বটে, কিন্তু অতঃপর এ সংসারে কিছু অসম্ভবা আছে বলিয়া সে বিশ্বাস করিল না। এক হস্তে চক্র চাপিয়া ধরিয়া সে অধর্মতঃ রোদন করিয়া উঠিল।—যেন সহসা। পৃথিবীতে প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে।—যেন প্রভাতের স্বর্ণে সূর্য্য এক প্রচুর প্রাকাশে সংসারে একবারে চূর্ণ কিছু হইয়া তাহারই পদতলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।—যেন তাহার ভক্তি। ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঙ্গলি—বাহী স্বর্ণতরীখানি মূৰ্ত্তির সংক্ষিপ্ত বেদনাকে অহত ও ব্যাহত করিয়া ঠিক যুক্তির কুল স্পর্শ করিয়াই কলক কালিমায় ভরিয়া গেছে।

বসন্তের চেতনা লুণ্ঠ হইত কিনা বলা যায় না, হইলেও ক্ষতি হইত।
হুর্গমের সঙ্গীনী

কি না বলা যায় না। কারণ সংসার তখন ঠিক ভাবে চলিতেছিল কিন্তু—তখন প্রভাতের গায়ে আলো ছিল কিনা—নিঃসন্দেহ সমীর ছিল কিনা—সমীরে জীবন ছিল কিনা—কোনটাই তাহার বহির্বিষ্ণুরণ্যক স্পর্শ করিতেই পারিল 'না—তখন বিধি ও ব্যাধি মানবের প্রাকৃত জীবনে কোন্টা সত্য এবং কোন্টা মিথ্যা তাহার কোন তথাই তাহার মন্দিকে প্রবেশ করিতেছিল না—এবং হয়ত' তাহার অধুন দেহ ধরাতলে লুষ্টিত হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইত না।

কিন্তু ঠিক এমনই সময়ে নন্দু একেবারে ক্ষিত্যৌ ব্যাঙ্গের মত ছুটিয়া আসিয়া বীরেশ্বরের উপর লাঙাইয়া পড়িল—আর তাহারই হস্ত হইতে অধিকরণ ছড়িত। লইয়া তাহারই মন্দকে এমনই দাকন আখাত করিল যে, সেহ একটা আখাতেই বারেশ্বর একেবারে বুঝিতে হইল, আর তাহার মাথা কাটিয়া প্রবল বেগে শোণিত ধারা ছুটিল।

( ২৬ )

তখন পূর্বাকাশে প্রভাত হইয়াছে মাত্র—সংসারের রথচক্র মেদিনীত
তদেশ নিবাসী মানবের কর্ণে ধরিত হইতেছিল না বটে, কিন্তু

১০৬
ধূর্গমের সাঙ্গিনী

অকালের কিরণীর ধরিত্রীর অঙ্গে আধিপত্যা বিষ্টার করিতে ক্রোধ করে নাই—আর তাহারই রণের সগুল্য অঙ্গে মিশ্রিত কণ সপকে পশ্চিমী শুধু তরিয়া যায় নাই, সে রণের অস্থগণের উভ নিঃশ্বাস ধরিত্রীর পুং উঞ্জিতার সদ্বং করিয়েছিলো। উপরে আকাশ সিদ্ধ বর্ণে একবারে রঞ্জন হইয়া উঠিয়াছে—হার নিশ্চিত বসমতী অনু রক্তাঙ্গুল্য দেহে ধরিত্রীকে শৃঙ্খিত করিয়া দিয়াছে—হার উপর ও নেচোর এই হীরা বিভূতি শোভিত ধারাব দর্শক্রপে শুধু বসমতী ও মৃত্যু নহে স্বৰ্গ, নরু এবং সঙ্গীত শিশুরা পর্যন্ত বিশ্বে অভিসম্পত হইতে রোদ্ধে।

এই বিষ্ময ও এই অনুপাতিত জনি শৃঙ্খল হইত—আকাশের ঐ চুরু রক্তিমা, জলা-কুস্ম-সক্রাশ রঞ্জের প্রধান অক্ষযভাব—হার ধরিত্রীর এই শোভিত সজ্জা, বীরবরের রক্তাঙ্গ দেহের শোভিত ক্ষণ যদি চিরহায় হইত—বসমতী মৃত্যু নরু ও শিশুদ্বার দেহ যদি পায় পরিণাম হইত—তাহা হইলে হয়তো সে ছবি জগতের চিত্রাঙ্গার এক অভিনব সম্পদ হইয়া উঠিত। কিছু বেহেতে যেখানে জীবন আছে—সেখানেই সম্পদ আছে—আর শৃঙ্খল থাকিতে আশারও অধিক নাই, তাই যাহা হইলে স্বমন হইত—তাহা শ্রীমতী হইল না। অক্ষয পরেই হতচেতন বীরবরের উঠিয়া মৃত্যু বসিল—আর তাহাকে বসিতে দেখিয়াই বসমতী হইয়া অত্য হরিণ শিশুর মহাৰুৎগ আসিয়া তাহার

- ১০৭
দুর্গমের সঙ্কিনী

পায়ের কাছে পড়িল—আর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিল—বাবা।
তুমি বাড়ী ফিরে চল—কেন এই ছোট লোকের সঙ্গে—

তাহার কথা সমাপ্ত হইল না—বীরেশ্বর অতি কষ্টে চক্ষু হৃদ বিস্ফোরিত করিয়া একবার তাহার দিকে চাহিল—চাহিয়াই চক্ষুর উপরকার শোভিত ধারাটা বাহ হইতে মুছিয়া দেলিল—তারপর একটা নদী থাকিতে ভগ্ন্যতে বলিল “আর কেন বসন্ত, আজ আমার মুখ নাই, কিন্তু আজ আমার পথ আর ঘরের দিকে নেই ত’—আজ আমার পথ ঐ—বলিয়া উপরের দিকে বলিল নির্দেশ করিয়া উপরের ঐ অনন্ত অকাল কি সমুদ্রের ঐ সমুদ্রত পাহাড় কোন জিনিসের সঙ্ক্রান্ত করিল—তাহ বসন্ত বুঝিয়েই পারিল না—দৃষ্টির মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কিন্তু বীরেশ্বর আর কেন দিকে চাহিল না ; কোন কথা কহিল না—বোধ হয় কথা কহিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না ; আর মেহ বা গ্রেম অথবা আঘাতের বেদনা যেন তাহাকে স্পর্শই করিতে পারিয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। যেন জীবন তাহার কোন বেদনাই নাই—সংসারে তাহার কোন রূপে নাই—যেন পৃথিবীতে তাহার দেনা পাওণা সব শোধ হইয়া গেছে। এমনই নির্ভিকার, এমনই অচংকল, এমনই গৌরীভাবে সে কুটার হইতে বাহিরে আসিল যে, ইচ্ছা-মৃত্যু ভৌত তদপেক্ষা নির্ভিকার ভাবে মৃত্যু বরণ

১০৮
হুর্গমের সঙ্গীনী

করিয়াছিলেন কিনা তাহা কেহ দেখে নাই বলিয়াই তুলনা করা গেল না।

পণ্ডাতে বসন্ত আসিতেছিল—হাত নাড়িয়া তাহাকে আসিতে নিবারণ করিয়া বীরেন্দ্র বোধ হয় স্বর্গ-পথ-যাত্রী রাজা যুধিষ্ঠিরের মতই বনপথ ধরিয়া চলিয়া গেল—শুধু সেই পার্বত্য পথে তাহার শোণিতাকৃত পদরেখা নারায়ণের বুকে বিপ্লবচরণ রেখার মত বোধ করি চির-জ্বালাত রহিয়া গেল।

আর বসন্ত হতভাগিনী স্নুকমার অদৃষ্ট কলনধি করিয়া এবং নিজে কি করিতে আসিয়া কি করিয়া কেফিল ভাবিয়া, হংশে কষ্টে নীরাঙ্গে একবারে প্রজ্ঞামান হইয়া পড়িল—আবার বারংবার রোষ-কষ্টায়িত নেন্দ্রে মুনিচার দিকে চাহিতে লাগিল—কিন্তু তাহার অবস্থা যে বসন্তের চেয়ে কোন অধিক ভাল তাহা কিছুতেই বোধ করা গেল না—যখন এই তুই নারীর পরম্পর চোখচোখে হইতেই উভয়েই কঠিয়া কেফিল।

কিন্তু ঠিক এই সময়ই গৈরিক বেশধারিণী স্নুকমা দেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল—এবং সমষ্টির শোণিতের দৃষ্টা দেখিয়া ভয়ে বিশ্বাসে বিবর্ণ হইয়া গেল। আর সেই কোন অত্যন্ত দিনের জ্যোতিষীর তবিযাদারী তাহার আগমনের পূর্বেই সফল হইয়া গেছে ভাবিয়া সঙ্গল ঢোকে চারিদিকে চাহিয়া বোধ করি স্ন্যামীর মৃত দেহেরহই

১০৯
দুর্গমের সঙ্গীনী

অমৃত্যু করিতেছিল—কিন্তু এই সময়েই বসন্ত ধীরে ধীরে তাহার কাছে আসিয়া। অত্যন্ত শুদ্ধস্রী কহিল ‘এসেছ’ হতভাগিনী, আর একটু আগে আস্তে পারলে না! তোমার ‘স্মারিত’ আর এখানে নাই—তিনি এই মাত্র এই বন পথে—

তাহার কথা সমাপ্ত হইবার আগেই স্মরণ। অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিল—তিনি বেঁচে আছেন বসন্ত?

এখনও আছেন কিন্তু সংসারে তিনি আর ফিরবেন না।

স্মরণ। তখনই উত্তর করিল—আমিরও ত’ ফির’ক না—কিন্তু সে যা’ হোক, আর তার পায়ের খুলা নিই, কিন্তু না তার আর দরকার নাই—আমি চর্চামান। তঁতর মনের কথা আর আমার মনের কথা আজ ছ’টোই অপরাধ রয়ে গেল—কিছুত তা’ হোক্ আমি আমার স্মারিত কাছে চর্চামান, আমায় মনে রাখিয়া বোন্।

বসন্ত বিশ্বাস প্রকাশ করিয়া কহিল—সেক রাণী, এই দুর্গম বনে তুমি তা’কে—

হাস্যমুখে স্মরণ। উত্তর করিল “আমার মন আর ক্ষণ আজ ছইই বদলে গেছে বসন্ত, আমি আজ দুর্গমের পথে সঙ্গীনী হব’ বলেই। বেরিয়েছি—স্মারিত ভোগেই কি সঙ্গীনী হ’তে হয় রে, তার যোগের সঙ্গীনী হ’তে নেই। তুই ফিরে যা বসন্ত—গিয়ে আমার রাণীগিরিতা। তুই ভাঙ কর’রে—আমি দেখি তিনি হয়ত’ কত দূরে গেলেন—

১১০
হুর্গমের সুঙ্গিনী

বলিয়া হাসি ও অশু মাঝা চোখে বিদায় লইয়া স্বমা সিংহিনীর মতই কি সিংহ-বাহিনীর মত সেই নিবীভ অরণ্য ভেদ করিয়া হুর্গম পার্বত্য পথে অন্ধরিত হইল।

সমাপ্ত

১০১
রাজার মেষে।

কেশব রায় যে দিন শক্ত করে রাজারা হইয়া বুড়া কেশবলালের নাম লইয়া বন্ধন করিলেন, সেদিন তাহার মৃত পুত্রের একমাত্র কন্যা কিশোরীই তাহার সঙ্গে গিয়াছিল। কারণ এ সংসারে এই বুড়িরাজার অষ্ট কেহ আমার শুধু ছিলই না। নব—বাহার। তাহার সম্পদে আমার সাজিতে আসিয়াছিলেন—উপহূর্পৃতি তাহার সর্বাগ্রে রাজ্যকে তাহ করিয়া গিয়াছেন—অভিনয়ের শেষে দলবদ্ধ নাট্যামোদীর মত।

কেশব রায় ছিলেন পূর্ব যুগের কৃত্রিম রাজা। তাহার রাজ্যও ছিল গুল্ম; কিন্তু বাহিরের এই কৃত্রিম রাজ্যের অধিপতির অস্ত্রে যে গ্রন্থাগুলি একেবারে সাক্ষাত ছিল, তাহার বিষ্ণু ছায়াতলে রাজ্যের গ্রন্থাগুলি নিরবিশ্বাস বাচ্চন্দ্রের দিন কাটাইত। কঠোর শাসন ও প্রজার পীড়ন সে দেশের রাজনীতিজ্ঞগণের কষ্টনাকে কর্ষণ করিতে পারিত না।

১১৩

৮
হুর্গমের সঙ্গীনী

কিন্তু মধু মিষ্ট বলিয়াই ত তাহাকে মৌমাছির দংশন সহ করিতে হয়। বঙ্গীয় জল শুষ্ক পাপীর গৃহেই ধর্ষণ করে না। তাহার প্রবল পরাক্রম কাছে পুণ্যাঙ্গী গৃহের শির নত করে, শক্তির পদে শান্তির সন্ধি প্রাপ্ত করার মত। দেশ তখন ধনধায়ে পূর্ণ; তাহার অভাব ছিল না বলিয়া চেষ্টাও ছিল না। আর দেশের বাহিনীর ক্ষুধিত মানবের বাস আছে, তাহার বোধ করি ধারণাও ছিল না, তাই আত্মরক্ষায় যত্নও ছিল না। কিন্তু দেশের অভাব ছিল না বলিয়া দেশের উপর ছন্দের দৃষ্টি পদ্ধতা অভাব ছিল না; সে দলে দলে আসিয়া নিজের অন্ত সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আর তাহারই একটা বিশ্লেষণ বাহিনীর কতকাংশ আসিয়া এই বৃহৎ রাজার শান্তিময় রাজ্যের পাশে দৈবের মত দাঙ্গাইল—শান্তির স্থানে শক্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে।

কিন্তু শান্তি একেবারেই শান্তভাবে নিজের আসন ত্যাগ করিতে চাহিল না এবং বিরাট যুদ্ধে শক্তির প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হইল না। কারণ কেবল রাজ শুদ্ধ মাত্র শান্তিগ্রহণ ছিলেন না, সে শান্তির অপহরণে কারীর দল বলিয়া বিপরীত করিতেন। যোবনে এই কেবল রাজ্যে একদিন সিংহের সঙ্গে লড়াই করিতে গিয়াছিলেন, এবং সে যুদ্ধে নিজেই শুদ্ধ আহত হ'ন নাই, সিংহকেও এমনই আহত দিয়াছিলেন যে, তাহার ভীষণ পর্জ্জনে শুধুর্লে বনভূমিই নয়,
দুর্গমের সঙ্কিল্প

সেখানকার পল্লীগৃহও প্রকল্পিত হইয়াছিল। কিন্তু আজ তাহার যৌথ নয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার একটি মাত্র পুনর্বার অকালে পিতাকে ভাগ করিয়া এই দুর্দশ বার্ধক্যের একমাত্র অসহায় অবস্থায় কেলিয়া গিয়াছিল যে, সিংহ কেন সেদিন মানুষের তাহাকে দেখিলে সেই না করিয়া থাকিতে পারিত না।

কিন্তু সম্পন্ন ও অসম্পন্নের মধ্যে যেমন প্রভূত আছে, শক্তিমান ও শক্তিহীনের মধ্যে তেমনই প্রভূত আছে। তাই মানুষ যাহাকে দেখিলে দয়া করিত, হুন তাহাকে আক্রমণ করিল, আর একদিনকার শক্তি-অতিমানী কেশব রায় সে আক্রমণ প্রতিরোধ করিলেন, শক্তিহীনের মত সঙ্কি প্রার্থনা করিলেন না।

যুদ্ধ হইল; কেশব হইলেও সংগ্রাম ঘোরতর ভূমি ধরিতে কৃত কার্য না; এষ্ট কেশব রায় বুদ্ধ হইয়া বিপক্ষের সনাপতিকে ভৃহদস্তই বধ করিলেন। কিন্তু জয়লঙ্গী তাহার করায়ত হইল না। কারণ ঠিক যে সময়ে কেশব রায়ের তরবারিতে হুনের ছই শির ভূলষ্টিত হইল, সেই মুহূর্তেই বিদ্রোহী হুনের দল "কেশব রায় মারিয়াছে--কেশব রায় মারিয়াছে" বলিয়া এমনই একটা সোরগোল তুলিল যে, কেশব রায় জীবিত কি মৃত সে বিষয়ে দৃঢ়পাত মাত্র না। করিয়াই তাহার বিলাসী সৈন্তগণ যুদ্ধস্তল ত্যাগ করিল। আর কেশব রায় তাহাদের গতিরোধ করিবেন কি আত্মরক্ষা করিবেন

১১৫
দুর্গমৈর সঙ্ঞিনী

কিছুই শিয় করিতে পারিলেন না—অগত্য। সত্যত্ব হইল না।

আর এই হনের দল যুদ্ধ জয়ের পর মুহূর্তেই বিজিত জাতির গৃহে গৃহে গিয়া বিজেতার শক্তি এমনই প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল, যে সুযুদ্ধ হইতে প্রাণ লইয়া যাহারা পলাইয়া আসিয়াছিল, সে প্রাণ ধারণ করিবার মত যথেষ্ট তঁহাকে করণ্ড পরিদিন প্রভোতের জন্ম গৃহে অবস্থিত রহিল না। তবে, অভ্যাচারে, লুঠনের আলায় গ্রেজারা গৃহ ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল—যাহারা। পলাইতে পারিল না তাহারা মরিল বা লুকাইল, যাহারা লুকাইতে লঙ্ঘিত হইল—তাহারা যুদ্ধ করিল মরিল, মারিল—শান্তির সাহায্যে শশাঙ্গনে পরিত করিল। আজ শম্ভকর অভ্যে মানুষের যাহা হয়—তাহাই হইল। কেশব রায়ের সাহায্যে মানুষের বাগান গুপ্তাই গেল।

কিন্তু পরের দিন উঘাসমাগমের পূর্বেই তাহার ধূমার্তিত রাজধানী ভাগ করিয়া পরাজিত প্রতাড়িত রাজা যখন প্রাণ করিতে যাইতে ছিলেন, তখন তাহার সেই বিপুল জনসংখ্যা রাজ্যও রাজধানীবর্ত্তী মধ্যে একটি মাত্র গ্রামীণ ভিন্ন সকলেই তাহাকে ভাগ করিয়া গিয়াছে।

কাল যেখানে অশ্বীয় ও অশ্বীতার অধি ছিল না, আজ সেই স্থান এমনই শুক্র, এমনই অন্যায় পূর্ণ যে কাল যে এখানে উৎসবের বান্তি জলিয়াছিল, সুবর্ণের উজ্জ্বল বায়ুত্রে মিলিয়াছিল, ১১৬
দুর্গমের সদ্ভাবনা

নূতালীলা রমণীর হাত ও লাল্টে স্বান ও প্রাণ পূর্ণ হইয়াছিল, কেতকীও কষ্টরীর মদিনগ্র্ম তরণ প্রাণ নুড়াদোহল করিয়া তূলিয়াছিল—আজ সেখানে তাহার রেখা মাত্র নাই। আজ প্রভাতের চাঁদল্প পৌষকের উল্লাস, পৌরীর আঙ্গনে ধূমান্ধত দুর্গ মধ্যে একেবারে এক প্রভাতের শৃঙ্গা করিয়াছিল যে, কাল যে এখানে একটা রাজ্যার বসতি ছিল—একট। প্রতিষ্ঠাত-শাসনি সাধ্রাজা ছিল, কাল পর্যায় এখানে যে একদল প্রজা পরম নিরুদ্ধে কালাপান করিয়াছিল—আজ আর তাহার চিহ্ন মাত্র নাই। শুধু অশকু ও উদেগ হাহাকার ও অন্ত্রনাদ উচ্চতি বায়ু তরঙ্গের মত সারারাজ্যে ছুটাছুটি করিতেছিল।

ঠিক সেই সময়ে সেই রাজ্যের যাত বছরের পুরাতন রাজ। যখন পৌরীর হাত ধরিয়া বাহির হইলেন, নূতনকে স্বান করিয়া। দিতে, তখন তাহার মুখ যতই প্রসন্ন থাকিত, অস্ত্রগুলির বোধ হয় এমন চক্ষুই ছিল না, যেখান হইতে তখন অশ্রু রেখা নারীর নলিন-নয়নের কষ্ঠল-প্রের বিদ্ধপ করে নাই; কিন্তু অন্যের অস্ত্রপূর্ব বাহাই হউক, মাস্তুবের আচরণে তাহার কিছুমাত্র বুঝা গেল না; কারণ সহায়তাই ও রাজ্য-ভাস্ত বোধ হয় সেদিন ভয়েই অনুর্ভূত হইয়াছিল। তাই যাহার প্রাণে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহারই মুখ দেখিলে বোধ হইতেছিল যেন সে নিজেই আঘাত করিতে উদ্দেশ্য হইয়াছে। কেবল একটুমাত্র প্রাণ সেই স্থিতির কেবল মধ্যে ও রাজ্যার মধ্যে গলিয়া গিয়াছিল।

১১৭
দুর্গমের সঙ্গীনী

—সে তাহার পৌত্রী কিশোরী। রাজার নিঃশীর প্রদর্শন কেহই ঠাহাকে একটা সাহসিক কথা বলিল না দেখিয়া—সে বলিল উঠিল
“দাছে হিংনিঃ তুমি বল ক'রে। না, আমি বড় হ'য়ে তোমাকে রাজা ক’রে দেবো।”

“দিবি?৷” বলিল রাজা সহাস্য মুখে তাহার পিঠ চাপড়াইতে গিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। আর সেই রূপে মুখে হাসি চোখে জল হইয়া রাজা বর্ষক্রান্ত দিবসের অঘটনের মত নিজ শাসনের বাহিরে চলিয়া গেলেন।

(খ)

তাহার পূরা দশটা বৎসর চলিয়া গিয়াছে। গ্রীষ্মের শীতলতা, শীতের শিশির দশবার আসিয়া গাছে পালায়, লতায় পাতায় প্রান্তরে, তাহাদের শাসনদণ্ড চালাইয়া গিয়াছে। পুরাতন প্রকৃতি অতি রুদ্র হইয়াও কিন্তু তাহার ঘোষনকে সেই সমুদ্র মধুময়, সেই রূপই পরিবর্তন-শীল, সেই সমুদ্র নব নব শোভায় লৌল নিকেতন করিয়া রাখিয়াছে। বাহিরের পৃথিবীর মত কোথাও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হই নাই। এই দশবৎসর পরিবর্তন হইয়াছিল কেবল কেশবরায়ের পৌত্রী কিশোরীর অঙ্গে, মনে, জীবনের বাহিক ও আত্মস্ত্রীক অবস্থার। এই

১১৮
দুর্গমের সঙ্গীনী

দশবৎসরে অষ্ট অনেক নারীর মতই এই কিশোরী কেশোর ছাড়িয়া মৌবনের মোহন সঞ্জোয়া পরিয়াছে। কিন্তু সেদিন তাহার অদৃশ্যে বাহিরে তাহার ব্যাঙ্গা অভাবের দৈনে এমনই পাশাপাশি চলিয়াছিল যে, একটাকে বাদ দিয়া আর একটাকে অবশ্য করা যাহতেছিল না। কারণ এই রূপসীর রূপরিশির সঙ্গে অপরিসম্ম দৈন্ত আর রাজপুত্রী হইয়াও বনবৃক্ষের ছায়া এই নারীর মধ্যে যে কঠোর মাধুর্যের স্তূতি করিয়াছিল, তাহা বোধ করি শ্রী কর্ষণ। করিয়া বৃক্ষবার বা বুঝাইবার সাধ্য কাহারও নাই।

পুরুষ দশটি বৎসর—এই দশবৎসরে কেশবরায় আরও বুঝি হইয়াছেন, আরও শক্তিহীন হইয়াছেন—একবারে শিশুর মত হুর্জল। এই বুঝি রাজা কালের শাসনে সেদিন এমনই অসহায় হইয়াছিলেন যে, সে সময় যদি তাহার মৃত্ত্যু হইত, তাহা হইলে তাহার মুখে ৰৎকার করা দূরে থাকুক, হয়ত হ্রাসাত্তরিত করিবার লোক পাওয়া যাইত না। রাজ্য-ভ্রষ্ট রাজা মাত্রুমের উপর একবারেই বীরভূত হইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় যেখানে বাইলে মাত্রুমের মৃত্ত দেখা যাইবে না। এইরূপ এক নিবিড় গহনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সে কানন এতই নিবিড় এতই মনুষ্য-পদচিহ্ন-সম্পর্ক শূন্য যে মধ্যে মধ্যে তিনি নিজের কঠোর, নিজের পদশব্দেই চমকিত হইয়া উঠিয়া নাই ভাবিতেন; আর তাহিতেন সেদিন তাহার মৃত্ত্যু হইবে, সেদিন এই কৃষ্ণ-কোমলা।

১১৯
ছব্রগমের দানিনী

বালিকাকে তিনি কোথায় রাখিবেন কাহার আশ্রয়ে রাখিবেন। কিন্তু সেদিন, এতবড় এই বিশ্বসংসারে তাহার এমন একটি আশ্রয় ছিল না, যাহার আশ্রয়ে কিশোরীকে রাখিয়া। তিনি নিশ্চিত মনে নিশ্চিতের পথে যাত্রা করিতে পারিতেন। শুধু ভাবনায়, বেদনায়, উদ্দেশ্যে তাহার অন্তর্গত অন্ত রহিত না।

কিন্তু উদ্দেশ ও অন্ততি তাহার যতই হউক, যাহা নিশ্চয় তাহা যেমন নিশ্চর, যাহা অন্তমান তাহাও সব সময়ে নির্নিয়ক নয়। কারণ মানুষের মন যে অন্তর্ভূমি; পৃথিবীর অন্ত সমস্ত আদেশ ও অন্তহীনতাই হয় তুল করা যায়, কিন্তু এখনকার আদেশ ও অন্তহীনতা এতই স্পষ্ট যে তাহাকে তুল করিতে হইলে মন্ত্রণালয়ের প্রতিঠিও তুল করিতে হয়। তাহ কেবলমাত্র যাহা অন্তমান করিতে ছিলেন তাহাই একদিন সত্যের মূর্তি ধরিল; আর ধরিল ঠিক সেই সময়ে যখন গণ্য-সমাহার মেয়াদিনী রাজার আশ্রয় স্থানকে আছাড় করিয়াছে, যেমন একদিন হুন আসিয়া তাহার রাজা আছাড় করিয়াছিল। আর রাজা সেই নিবিড় পশ্চে সেই মৃদু অকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ঠিক সেইস্থানে আসিয়া হাড়িলেন, যেখান হইতে চিন্তামণির চরণ আর বেঁধের নয়।

হারয়ে। মৃদু মানবকে নিশ্চিত করে লক্ষ, কিন্তু এই রাজা চিন্তামণির পূর্বেই চিন্তার এমন চিন্তামত। আরম্ভায় আসিয়া পৌঁছিয়ে।

১২০
দুর্গমীর সুগিনী

নে সে স্থান ছাড়িয়া তিনি যদি সত্যই কোন দিন চিন্তাঘরণের চরণ-ভুলে পেঁছিতে পারেন, তাহা হইলেও তাহার চিন্তারাশির শেষ সীমায় আসিয়া পেঁছিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ।

নগর ছাড়িয়া তিনি যেদিন বনে আসিয়াছিলেন, সেদিন তোহঁর সঙ্গে ছিল তাহার পৌত্রী, আর তাহার পৌত্রীর সঙ্গে ছিলেন তিনি। আজ সেই একশাখ-রুক্ষের একটীমাত্র শাখা বা কাঁঠকে যদি গ্রামচ্যুত করা হয়, তাহা হইলে জীবন সংহয় যে উভয়েরই হইবে, একথা যে কিন্তু তাহাই তুল করিতে পারিতেছিলেন না, তাহাই প্রায় অনন্তচুদ্ধন অতিক্রম করিয়া অনলের চরণতলে পেঁছিয়ার ঠিক পূর্ব মুহুর্তেই তাহার বেদনা হইয়াছিল অন্ত। আর সেদিন মিত্র না হউক, অন্ততঃ একজন শক্তকে পাইলেও তিনি কিশোরীর ভার দিতে পারিতেন। মনের মাথায় না হউক বনের মাথায় যে সিংহ ব্যাঙের চেয়ে মাথায়ের বড় আমূর্ব এ সভ্যতের অবিশ্বাস করিবা মত মনের বল সেদিন আর তাহার ছিল না।

( গা )

এসময়ই সময়েই একদিন এক নিশ্চিতরাত্রে রাজা একবারে শ্যামাশায়ি হইলেন আর উঠিবার জন্য নয়। এককো রাজা বুঝ অক্ষয়, সঙ্গে তাহার একমাত্র নারী, বৈষ্ণব নাই, ঔষধ নাই, পরামর্শের ১২১
ছুর্গমের সঙ্কিনী

লোক পর্যায়্য নাই। গভীর রাত্রি; তখন বাহিরে বৃষ্টি ও বজ্রাত্ব পৃথিবীতে মহাপ্রলয়ের স্থখ। করিয়াছে, তখন দূর আলাপের দামামাঝারি নিবিড় কামনের প্রাপ্ত হইতে পারা প্রতিপন্ন করিয়াছে, তখন ঈশানের বিষাণ বাজীয়াছে, কুঙ্কুমে তাহার রৌদ্ররূপে প্রক্ষ করিতে। আর ভিতরে, সেই উত্তেজিত প্রকৃতির নিকুঠত অষ্টম, কূচে কুটীরে রাজা কেবল রূপ শৈল্য আছেন, দীন ক্ষীণ শীর্ষ, একবারে শিরাস্তক। শিয়রে তাহার কিশোরী, পূর্বাচ্ছ, নিরাধরণ। রাজকন্যা তথ্যি চীরমাক্ত-ধারিণী, রূপমধু, ভাবমধু, আবেগময়ী একবারে বৈশাখের নবনীরদমালার মত, ভাদ্রের ভরা নদীর মত। যেন বাহিরের এই উল্লাসপূর্বতির নির্ধম প্রহার হইতে রক্ষা করিবার জন্য মৃত্যুকে কোলে করিয়া মুক্তি বিসমিলি আছে।

আর তাহারও পশ্চাতে এই পীড়িত ও সেবারের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে এই ঝড় ও বৃষ্টির রাতে সশ্বেত এক হন যে সেখানে অসিয়া দাড়াইয়াছিল, মৃত্যুলায়ক একেবারে মৃত্যুর উপকূলে পৌছাইয়া দিতে, তাহার বোধ করি কেবল অন্তর্বীকৃত জানিতেন, তাই রাজাকে যেন স্বাক্তিক দেখিয। কিশোরী যখন জিজ্ঞাসা করিল “দাহমণি! বড় কষ্ট হয়েছে কি?”—তখন কেশব রায় হাসিয়া জবাব দিতে যাইয়েছিলেন। সহস্র একটা স্ন্ততীক তীর আশিয়া একবারে রাজার মাধ্য কাছে মৃত্যুতেই বিদ্ব হইল, আর এই দুই অসহায় নরনারী সহস শক্র

:২২
হুর্গোমের প্রবিধি

আক্রমনে আত্মীত হইয়া আর্টনাদ করিব উঠিল। কিন্তু তাহাদের সে আর্টনাদ নিবিড় অরণোর বুকে রব প্রতিধ্বনিত হইয়া। ফিরিবার পূর্বেই এক ভীষক হন ভীষণ তব্যবাচ হস্তে কুটিরে প্রবেশ করিল, আর একবারে রাজার মাথা লক্ষা করিয়াই তাহার তব্যবাচ উঠাইল। আর রূপ রাজা ভয়ে বিষয়ে বিষয় হইয়া। “কিশোরী পালিয়ে আয়, কিশোরী পালিয়ে আয়” তোমাদের মার্বেল, বলিতে বলিতে তাহাকে আকর্ষণ করিতে গিয়া। গৃহমধ্যে প্রাচীপতাই উঠাইয়া। ফেলিলেন, আর সেই মূহূর্তেই অত্য এক শক্তিমায়ের স্থানের বলম্বন আসিয়া একবারে হঁসের পৃষ্ঠ ভেদ করিয়া। ফেলিল। রাজার স্থানে হন আর্টনাদ করিয়া ধরাশায়ী হইল।

কিন্তু কেমন করিয়া। এমন হইল—কে আসিয়া এই অঙ্গকারে হনকে বিনাশ করিল, কাহার মন হত এই পীড়িতে—এই অনাথের সুবাস এমনই করিয়া নিয়ে জিত হইল। নরের আকারে নারায়ণ আসিয়া সত্তাই কি। এই হুর্গলের পাশে দাড়াইলেন—সত্তাই কি।—কিন্তু কিছুই স্বর্ণ করিতে পার। গেল না। আদুরে তখনও হন আর্টনাদ করিতেছে, হয়ত রক্ষণভোত এখনই রাজার অংশ। আসিয়া স্পর্শ করিবে—এই সব ভাবনার সম্মিলিত আক্রমণকে উপেক্ষা করিয়া রাজা যখন হুর্গল দেহ লইয়া উঠিয়া দাড়াইলেন—তখন হনের শেষ আর্টনাদ তাহার কেটেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

১২৩
দূর্গমনো সকীনী

বাহিরে তখনও বারু প্রবলবেগে কুটীরে, প্রহত হইতেছিল, রুক্ষ রুক্ষ ধরিয়ে বনামীর আর্চনার দূরে ও অন্ধকার তখনও স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল, ঝাপটে ঢাপটে বারি ধারা। তখনও ধরার বক্ষ দলিত মথিত করিতেছিল, আর আকাশের বক্ষে কৌণ্ডিলিক বিদ্যুৎ বেহা। ভয়ে ভয়ে প্রাকাশ পাইয়া ভয়েই অষ্টহিত হইতেছিল। বাহিরে মহামার ভিতরে মহামার—মধ্যে তাহাদের পুরুষ অন্ধকার, নৌব গাড়িরোই বোধ হয়, কুটীরের জীবিত ও মৃত প্রাণী মাত্রকেই ক্ষণকালের জন্য নৌব করিয়া দিল।

কিন্তু হনের শেষ আর্চনার তাহার কণ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল যখন বুঝা গেল যে, তাহাকে আর বাচান যাইবে না, তখন হতাশ হইয়াই তাহার হত্যাকারী উঠিয়া দাড়াইয়া নিভৃত স্থানে কণ্ঠে জিজ্ঞাসা। করিলেন “এ কুটীরে কে আছেন, পারেন ত একটা আলো আলুন, হুন মরিয়াছে।”

অন্ধকার হইতেই রাজ। প্রশ্ন করিলেন “আমাদের রক্ষাকর্তা আপনি কে?”

“আমি একজন সৈনিক মাত্র কিন্তু পরিচয়ে প্রয়োজন কি মহাভাগে। আপনি নির্ভয় হইয়াছেন আলো আলুন।”

কিন্তু আলো। যখন আলো হইল, তখন এই সৈনিকের অঙ্গ রাজনীতি দেখিয়া রাজা একবারে বিশ্বাস হইয়া গেলেন। আর

১২৪
অন্তর্বাচ্য যে সত্যই তাহাকে মুক্তি দিবার জন্য বরাহাকর প্রসার করিয়াছেন, তাহা আর বুঝিতে বাকী রহিল না। বলিয়াই আমন্দেরও অবধি রহিল না। তিনি করালুলি সময়ে সৈনিককে সন্ধেতে ইচ্ছিত করিয়াই কিশোরীর দিকে চাহিয়া বলিলেন শ্রেষ্ঠ কি কিছুই নাই বোন—আজ রাজ-অতিথি আমার দ্বারে এসেছিল অতুল্য থাকবেন?

কিশোরী এতক্ষণ রক্তাক্ত কলাক্রান্তিতে হংসদার দিকেই চাহিয়াছিল। রাজার কথা শুনিয়া অতিথির পানে ফিরিতেই সে একবারে স্নায়ত হইয়া গেল; ঠিক এই লোকটাকেই সে আজ প্রভাতে বনের মধ্যে বিচরণ করিয়ে দেখিয়াছিল, কিন্তু সে আজে কিশোরীকে লক্ষ্য করিয়াছে, এমন কি তাহার আবাসস্থলেরও সন্ধান লাইয়াছে, তাহা সে মোটই বুঝিতে পারে নাই। পারিলে হয়ত সে মিষ্টের বাসের সন্ধান এই লোকটাকে কিছুতেই দিত না, হয়ত বনানীর নিবিড় রক্ষায় এতের আমন্দারে আচরণ করত যে, এই কুটীরের সন্ধান সে কিছুতেই পাইত না। কিন্তু উদ্দেশ্য তাহার যাই থাকিলক, এই লোকটা তাহি আজ কুটীরের সন্ধান না পাইত এবং ঠিক এই সময়ে আসিয়া উপস্থিত না হতে, তাহা হইলে আজ ঐ হৃদয়ে গৃহে কাহার দেহ প্রলম্বিত হইত তাহা। ভাবিতেও সে শিক্ষিত উঠিল।

কিন্তু তাহাকে অথবা বিলম্ব করিতে দেখিয়া রাজ। অসহিষ্ণুতাবে জিজ্ঞাসা করিলেন “কি বরে কি কিছুই রাখিয়া নাই কিশোরী?”

১২৫
হর্ষমের সঙ্গীনী

“এই যে দিই দাদামণি! কিন্তু আপনার রাজ অতিথিকে শুধু ছুটে বনের ফল—বলিতে বলিতে কিশোরী অতিস্ত কুন্নমনে গোটাকথেক ফল আমি। অতিথির সমুদ্ধে রাখিল। অতিথি হাত্তারো তাহা হইতে একটা ফল তুলিয়া লইয়া বলিলেন, “আজ কার আতিথোষ সমর্থিত হ’চ্ছি মহাভাগ ?”

চিন্তামাত্র না করিয়া কেশব রায় উত্তর দিলেন “শ্রীমতি কিশোরী দেবীর—বলিয়াই কিশোরীর দিকে চাহিয়া। তিনি ঈষৎ হাস্ত করিলেন।

রাজার হাস্তের প্রত্যুত্তরে কিশোরী বলিয়া উঠিল “পরিচয় সম্পূর্ণ হ’ল না দাদামণি, আমি যে শুধু কিশোরী নই, রাজ। কেশবরায়র গৌণি কিশোরী—

কিন্তু এই পর্যায় বলা হইতেই আগন্তুক সহসা উঠিয়া দাড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন “সে কি মহারাজ! এই নিবিড় অরণ্যে সিংহশার্ডুলের সঙ্গে”——

হাস্তমুখে কেশবরায় উত্তর দিলেন “কিন্তু এইখানেই আমি সঙ্গী পেয়েছি বন্ধু, কারণ মানুষের সঙ্গ আমার আর সঙ্গ হ’ল না রক্ষা করুন। তাই মুতাব মুখে আমি বনেকেই আমার আশ্রম করে তুলেছি। আর এই বনেই দশ বৎসর পরে একজন অমানুষের পশ্চাতে আজ মানুষের সঙ্গান পেয়েছি—পরিচয় সম্পূর্ণ করুন মহাভাগ।

১২৬
“কাশ্মীরের যুবরাজ হিরণচাদ আপনার আতিথ্যে সম্মানিত হ’ল। কিন্তু তার জন্য বায় হবেন না মহারাজ! এই গৃহের দীর্ঘ নিন্দিক আশ্চর্য রাজা। আজ থেকে আপনি আমার বহু সম্মানিত অতিথি হবেন”

“কিন্তু তা’ হয় না যুবরাজ, হন যেদিন বলে আমায় পরামুঠ করে রাজা ও সিংহাসন দখল করেছে, আর তার সঙ্গে মানসিক সংঘে থেকে বঞ্চিত করেছে সেইদিন আমি বনাশ্ম গ্রহণ ক’রেছি। আমি আজ এত পীড়িত হ’য়েছি যে, দশবৎসর যে গৃহে বাস ক’রেছি, সেই গৃহ হয়ত আমায় আর দশদিনও আশ্রয় দেবে না। কিন্তু তবুও আজ তার সেই আলিঙ্ককে আমি তাঁর কর্ত্তরে পার্থ না। আপনি বরং আমার মৃত্যু পর্যাপ্ত অপেক্ষা করুন।” কিন্তু এই সময়েই কিশোরী স্ত্রীহার কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল “তা’ও হয় না দাদামণি, যে রাজ্য আমরা হারিয়েছি তা’র পূর্বকালে না কর্ত্তরে পালে’ এ জীবনের যেমন প্রয়োজন নাই, এ বন্দুকমত্যেরও তেমনই প্রয়োজন নেই, আমি যে আপনার রাজ্য ফিরিয়ে দেব দাদামণি; আপনি বরং যুবরাজকে বলুন, তিনি আমাদের কিছু সৈন্ত সাহায্য করুন, আমরা আর একবার আমাদের হতরাজ্য পুনরুদ্দারের চেষ্টা করি।

কেশবরায় উচ্ছাসে বলিলেন মাত্র, কিছু বলিলেন না। কিন্তু রাজপুত্র কণকাল নীরব থাকিয়া বলিয়া। উঠিলেন “তাঁর চেয়ে
মহারাজ, আপনি আদেশ করন, আমি আপনার হৃদয়ে পুনঃপ্রার্থনা করে দেই।”

রাজা সন্ত্রস্ত হইয়া বলিলেন “না না এ আপনি কি বললেন রাজপুত্র, আমি নিজে হ’য়েছি বলে আজ আমার আত্মাকে আমি মৃত্যুর মূখে পাঠাতে পারি না, রাজ্যে আমার কোন একের জন্য নেই রাজকুমার, আমার মৃত্যুর পর এই হতভাগিনীকে তুমি আশ্রয় দিও। কারণ আমার মৃত্যুর পরে পৃথিবীতে তার দ্বিতীয় আত্মীয় জীবিত থাকবে না, আমি বড় দুঃখল হ’য়েছি আর কথা কইতে পারি।” বলিয়া বোধ হয় তিনি উষ্ণত অশ্রিবিদ্বূক্ত চাপা দিলেন।

কিন্তু রাজপুত্রের অন্তর্ভাব বোধ হয় প্রস্তুত হইয়াই গিয়াছিল। উঠিয়া টাঁওলাহা গাঢ়নে বলিলেন “রাজা, যোবরাজ্যে অভিষিক্ত হ’য়ে আমি বেরিয়েছি আমার শক্তিও মেধার পরীক্ষা করে। স্বয়ং পেয়ে আজ শক্তির পরীক্ষা না ক’লে’ ক্ষরাজ শক্তি অপমান হবে। আর আজ ধার মহৎ আশ্রয়ে আমি অক্ষত না অভিভূত হ’য়েছি তাকে প্রতিষ্ঠিত না ক’লে রাজপুত্রের অমৃত্যু হবে। আমায় বিদায় দিন মহারাজ, আমি এইখানে থেকেই বুদ্ধিমান করি। কাল হৃদয়ের শেষ ফিরণ রশ্মি অত্যন্ত অন্তর্মধ্য হ’বার আর আমি বা আমার মৃত্যু সংবাদ আপনাকে জয় পরাজয়ের বার্তা জানিয়ে দেবে। বিদায় মহারাজ।” এইমাত্র বলিয়াই তিনি হৃদয়ের মৃত দেহটা পুনরায়।

১২৮
বর্ষা বিষ্ণু করিয়া লইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কিন্তু বাহিরে বাইবার সময় তিনি সহস্র কি জানি কিসের আকর্ষণে একবার পশ্চাৎ ফিরিলেন, ফিরিতেই দেখিলেন একজোড়া সঞ্চল-কোমল-অাঁখি-পল্লব তীহার প্রতি শ্রদ্ধায় ও ক্ষুজ্জ্বতায় ভরিয়া গিয়াছে।

(আ)

ঠিক সেই দিন গৃহতঃকালে কিশোরী যখন বর্ষাহতে প্রতিদিনের মতই ফল আহরণ করিতে বাহির হইয়াছিল তখনই বনের দুই প্রান্ত হইতে একই সময়ে সে এই ছনের ও রাজপুত্রের নয়নপথবর্ত্তী হয়। সে নিজে রাজপুতকে দেখিয়াছিল বটে, কিন্তু রাজসেন যে শুভায়কে দেখিয়াছিলেন, আর দেখিয়াছিলেন ঠিক সেই সময়ে যে সময় এই তুলনী রূপসী বর্ষা দিয়া বৃষ্টির ফল আহরণ করিতেছিল তাহ। তুলনী নিজে বুঝিতেই পারে নাই। কিন্তু সেই উর্দ্ধ-বাহু তুলনীর পরিপূর্ণ মুখের অপভ্য শুরুর তরুণ কিরণ কি বিচিত্র বনে বিকাশিত হইয়া দাইয়াছিল, আর অপর দিকে সমত ইল্লিয় দিয়া এক ভাবে সে মুখের প্রতি চাহিয়াছিল, চাহিয়া মুঠি হইয়াছিল, তাহা বোধ করি কোন অশ্রীরী দেবায়। ভিন্ন আর কেহ দেখিতে পায় নাই।

১২৫
দুর্গমের সঞ্চোচন

বন এইদিন পরে মানুষের আবির্ভাবে সে একটু ভীত ও চক্তি হইয়াছিল সত্য, কিন্তু মহুস্য-সমাগম-সম্প্রদায় বিহীন বন মানুষের আগমনে সংহীনতার অভাব দুই হইবে ভাবিয়া তাহার অন্তর্ব উৎফুল্ল হয় নাই, একথা বলিলে কিশোরীকে মনুষ্য শেষীর বাহিরেই ফেলিতে হয়। কিন্তু পরক্ষণেই রাজার সঙ্গে সৈন্য সহচর দেখিয়া কতকটা ভয়েই সে যখন নিজেকে সাধারণ বনান্তরালে প্রচুর রাজ্যের কুটীরে ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহার দাদামণিকে সংবাদ দিতে—তখন হুন ও রাজপুত্র যে বিভিন্ন দিক হইতে তাহার কুটার লক্ষ্য করিয়াছিল, তাহার মোটেই বুঝিতে পারে নাই। তার কুটীরে আসিয়া রাজাকে অধিকতর পীড়িত দেখিয়া কথাটা তাহার অন্তরে অধিকক্ষণ হানতে পার নাই।

কিন্তু নিন্তরের অগুলো সঞ্চালনেই বোধ হয় ঠিক নিশা-সমাগমের পুরুষ নুহভেই আকাশ যখন ভাগ্য গর্ভ, তখনই এই ছই জন নবাগত নর কুটারের উদ্দেশ্য যাত্রা করিল, একজন সুন্দরী অপহরণ করিতে, অন্তঃ এই কুটারবাসিনীকে গুরুল বৃত্তি ও ঝটিকার আক্রমণ হইতে প্রায়োজন বৃহৎ রক্ষা করিতে; কারণ এই নিবিড়তনে বিদ্বেষবাগীষ্ঠ রাজপুত্র এই সুন্দরী তত্ত্বীকে দেখিয়া এতই বিশ্বাস হইয়াছিল যে, এখানে এই বালিকার থাকিবার কি প্রায়োজন হইয়াছে, এবং সে কোথায় কি ভাবে আছে, তাহা জানিবার

১৩০
দুর্গমের সম্প্রতি

কৌতুক একেবারে অদম্য হইয়া উঠিতে ছিল; তার সহায় প্রাক্তন যখন ঝড়ে ও জলে বন্তুমি বারণবার প্রকাশিত হইয়া উঠিতেছিল, তখনই সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল যে, এই স্বল্প শাঙ্কল পরিবেষ্টিত অরণ্যে, এই রাত্রে কুটিলবাসিনী একাকিনি কি করিবে।

কুটিলবাসিনী কি করিত, হাড়া অন্তর্ভুক্ত হবেন, কিন্তু রাজপুত্র আসিয়া যখন কুটার হইতে কিছুবে এক বসতিতে দাড়াইলেন, তখন সহসা আকাশে বে আরেকো আঁখি প্রকাশ করিল অজানিত হইল, তাহারই আলোকে তিনি দেখিলেন এক ভাসকার পুরুষ উন্মত্ত অদ্বিয়তে কুটারে ভাসিয়া লোক কর্করেছে। দাৰুণ অপ্রস্তুত।

একেবারে দারুণ; একটিমাত্র পদক্ষেপ করিলেও তখন দৃষ্টিতে প্রায়শঃ হয়, অপ্রস্তুতে তাহাও করা যায়। না—সেখানে এভাবে অপ্রস্তুত।

কিন্তু তবুও তিনি ঝটিকা উপেক্ষা করিয়া যখন কুটায় দ্বারে আসিয়া দাড়াইলেন, তখন কুটায় অবর্তন দ আর্জিত হইয়াছে। রাজপুত্র স্মৃতিমাত্র না করিয়া তোমার পুরুষ শাসিত করিলেন।

কিন্তু রাজপুত্র চলিয়া যাইলে কেশব রায় যখন অস্ত্র হইলেন, তখন রূপে ছাড়িয়া গিয়াছে, ধরিত্রী অপেক্ষকৃত যাত্রী মূর্তি ধরিয়াছে।

বাহিরে চাহিয়া তিনি একটা দায়িত্বের ভাগ করিয়া সহসা রূপে বলিয়া উঠিলেন “রাজ্যে, তোমার জন্য আমি একটা তরুণ প্রাণ মৃত্যুর মুখে ছুটে গেল” বলিয়াই তিনি মুখ চাকিয়া ধূতা পড়িলেন, অপর

১৩১
দুর্গমের নাঙ্গনী

পক্ষের মুখের ভাবটা যে এই অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত বাক্যে কি বর্ণ ধারণ কারল তাহা লক্ষাও করিলেন না।

( ৭ )

নিশা অবসানে আবার প্রসন্ন নবীন মৃত্তিকে প্রভাতের উদয় হইল; কিশোরীর স্বীয় সজল মুখকান্তির মত প্রভাত; গ্রাম, শীতলতা, সিংহ রুক্ষপলবের ধামশোভায় বিশোভিত, পক্ষী-কুজন-মুখ্যবিশিষ্ট শীর্ষে তাহার কনককিলাট। যেন বিগত রজনীর বিতাড়িতকামী খৃষ্টকে মানবের মন হইতে একেবারে নিঃশেষে তুলিয়া। সহায় জগত প্রভাত আজ সর্বজন-মোহন মৃত্তিকে এই কাননে প্রথম পদার্পণ করিয়াছে।

কিন্তু আজ কাননের শোভা, প্রভাতের রূপ, প্রকৃতির এমন স্বেচ্ছায় প্রকৃতি কাননবাসী রাজা বা সে কাননের রাণীকে কিছুদায় তৃপ্তি দান করিল না। বিগত রজনীর শুভ দণ্ড ব্রুণের মত এই ছই তর্ক ও করণ প্রাণকে নিয়ত বেদনাবিদ্ধ করিতেই লাগিল, আর তাহাদের জন্য আর একটি তর্ক প্রাণ যে, রণে আজ কত খানি শোণিতকষ্ট করিতেছে তাহাই ভাবিয়া ভয়ে বেদনায় অকল্যাণ আশকায় পুনর্পুনঃ শিহরিত হইতে লাগিল। সেদিন তাহাদের আহারার্থ পর্য্যন্ত হইল না।

১৩২
দুর্গমের সঙ্গীনী

কিঞ্চিৎ দিনের তাহার দৈনিক জীবনের মধ্যপথে আসিয়া উপস্থিত হইলে, একজন অখ্যারোহী কানন-প্রান্তর প্রতিদিন করিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, প্রথমমুখে তাহাদের পরাজয় হইয়াছে এবং যুবরাজ রাজাকে আত্মরক্ষা করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। কারণ তিনি দ্বিতীয়বার আক্রমণ করিয়াও যদি পরাজিত হন তাহা হইলে অবশ্য তাহার জীবিত দেহ ফিরিয়া আসিবে না, কিন্তু হন আসিয়া যেন রাজাকে আক্রমণ করিতে না পারে। কিন্তু তাহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই কিশোরীর গৃহ হইতে তববারী ও বর্ষা লইয়া বাহিরে আসিয়া সৈনিকের অধিকবর্ষা ধরিয়া দাড়াইল——দাড়াইয়াই রাজার দিকে চাহিয়া শহু বলিল “দাদামণি।”

রাজা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া বলিলেন “য়া কিশোরী, আমি চাড়া আমার বিভীষণ সৈন্ত ও সমস্ত তুই, কিন্তু দাড়াই। সৈনিক, আর একটা অক্ষ পাও না ।”

সৈনিক ইতনতঃ করিয়া বলিল, তাহাদের শিবিরে বোধ হয় আর একটা কুড়া অক্ষ আছে, কিন্তু——

তাহার কথা শেষ না হইতেই রাজা বলিলেন “চল ভাই, আমি সই অক্ষ এই চাই, কারণ সই আমার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত হবে।”

তারপর অক্ষ ও অক্ষ লইয়া রাজা যখন কিছুদেহ লইয়া যুদ্ধস্থলে প্রবেশ করিলেন, তখন কর্ণ্য অক্ষ গিয়াছে। কিশোরীকে পাশে রাখিয়া

১৩০
দুর্গমের সঙ্গীনী

তিনি যখন রণমণ্ডল হিরণচাদের পার্শ্বে গিয়া দাড়াইলেন, তখন প্রতি-পক্ষ দুর হইতে এমন এক বর্ষা নিক্ষেপ করিয়াছে যে, হিরণচাদের নিকেতা বর্ষা বিপক্ষের অঙ্গ স্পর্শ করিবার আগেই হিরণচাদের বহু বিদ্ব হইবে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। রাজা মুহূর্তমধ্যে যুদ্ধরঙের ঘোড়াকে এমনই আঘাত করিলেন যে, ঘোড়া একলম্বে পাঁচ হাত দূরে গিয়া শুইয়া পড়িল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে বিপক্ষের বলম আসিয়া রাজার দক্ষিণ যুদ্ধে বিদ্ব হইল; রাজা অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াও আমন্ত্রন করিলেও পারিলেন না। কিন্তু হিরণচাদ সেদিকে অ্যাচে মাত্র না করিয়া অথব হইতে নামিয়া তুষকে আক্রমণ করিতে ছুটিলেন, কিন্তু তৎপুরুষই তাহার বর্ষা আসিয়া তুষকে বিদ্ব করিয়াছে। একাক্ত সমুদ্রে যুদ্ধরঙের দেখিয়া লুণ তরবারী বাহিরের করিতে চেষ্টা করিল, আর সেই মুহূর্তেই যুদ্ধরঙের তরবারী তাহার সকল আকাঙ্ক্ষা নিটাইয়া দিল।

যুদ্ধ শেষে হিরণচাদ ও কিশোরী রুদ্র কেশবরায়কে ধরিয়া যখন রাজ প্রাপ্ত করিল, তখনও রাজার যুদ্ধ হইতে প্রফুল্লিত শোণিতক্ষণ হইতেছিল; তাহাকে সিংহাসনের সমুদ্রে আর্নিয়া হিরণচাদ বলিলেন ‘রণজয়ী মহারাজ! এই আপনার সিংহাসন, আপনি শুদ্ধ যুদ্ধই জয় করেন নি, আমারও জীবন দিয়াছেন। আপনার সিংহাসন বহন মহারাজ।’

১৩৪
দুর্গমের সঙ্গীনী

কিন্তু রাজা সে কথার কোন উত্তর না দেওয়াতে কিশোরীর কাছ দিয়া বলিল, ‘দাদামণি এই যে তোমার হারানো সিংহাসন।’ কঠোর হাসিয়া রাজা বলিলেন ‘হা’ বোনু তুই তোর কথা রেখেছিস, কিন্তু এত আজ আমার জন্ত নয়; আর কায় জন্ত দেখিয়ে দিই—এই বলিয়া তিনি কিশোরীর সুরু রঘুরাজকে সেই সিংহাসনে বসাইয়া বলিলেন ‘এই আমার সরচেয়ে বড় রাজালাভ হ’ল কিশোরী; মহারাজী! আজ তোমার অতি বৃদ্ধ প্রজ্ঞা, বড় আনন্দে তোমায় আশীর্বাদ ও অভিবাদন করেছে—এই বলিয়াই তিনি সেই হরমতলেই গিয়া পড়িলেন। আর হিরণ্টাল ও কিশোরী রাজদেহ তােড়াতাড়ি ভূমি হইতে উঠাইতে গিয়া দেখিল যে, কেশবরাজের দেহ মাত্র পড়িয়া আছে—সে দেখে কেশবরাজ নাই।

সমাপ্ত।

১৩৫